পঞ্চম অধ্যায়

হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্ব : নিম্নবর্গীয় চেতনায় প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের বয়ান

৫. সূচনা
৫.১ কথাবিশ্বে নিম্নবর্গের শ্রেণিচেতনা
৫.২ কথাবিশ্বে নিম্নবর্গীয় প্রতিবাদের ধরন ও স্বরূপ সন্ধান
৫.৩ কথাবিশ্বে নিম্নবর্গীয় নারীর প্রতিবাদ
৫.৪ নিম্নবর্গের নিষ্ক্রিয়তা ও প্রতিবাদহীনতা
৫.৫ নিম্নবর্গের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ব্যর্থতার আখ্যান
৫.৬ সারাংশ

৫. সূচনা

'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর আলোচনা অনুযায়ী উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গ সম্পর্কটি ক্ষমতার এককে একটি বিপরীত অবস্থানে অবস্থিত। যেখানে মূলত আধিপত্য ও অধীনতার সম্পর্কটি প্রকট হয়ে ওঠে। এই বৈপরীত্যের কারণেই নিম্নবর্গকে প্রায়শই শোষিত-বঞ্চিত হতে দেখা গিয়েছে। এক্ষেত্রে উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গের চেতনার বৈপরীত্যকে নির্ধারণ করতে গেলে দুই পক্ষেরই নিজ নিজ ক্ষেত্রের সক্রিয়তা ও দুর্বলতাকে নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এমনটা নয় যে, নিম্নবর্গ পরাধীন বলে তারা সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। উচ্চবর্গের বিপরীতে নিম্নবর্গীয় চেতনা কোনো না কোনোভাবে তাদের সক্রিয়তা প্রকাশ করতে সক্ষম। আর নিম্নবর্গের সক্রিয়তা ও স্বতন্ত্র চেতনার অস্তিত্ব তখনই ধরা পড়ে যখন তাদের মধ্যে শ্রেণিচেতনার মধ্য দিয়ে উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাই বলেন-

> 'অধিকাংশ সময়ই নিম্নবর্গকে দেখা যায় নিষ্ক্রিয়, ভীরু; একান্ত অনুগত জীব হিসেবে। অন্যে চালিত করলে তবেই যেন সে চলে। একমাত্র প্রকাশ্য রাজনৈতিক বিরোধ, বিশেষ করে বিদ্রোহের সময়ই শাসকগোষ্ঠী তাকে সক্রিয় প্রতিপক্ষ বিষয় হিসেবে গ্রাহ্য করে।' (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ. ৮)

অর্থাৎ অধিকার ও প্রাপ্য বিষয় যখন সরাসরি বঞ্চিতরা পাচ্ছে না, তখন তা ছিনিয়ে নেওয়ার প্রবণতা থেকে তৈরি হয় শ্রেণিচেতনা ও প্রতিবাদের মানসিকতা। দৈনন্দিন দাসত্ব, শোষণ-বঞ্চনা-নিপীড়ন-অন্যায় দিনের পর দিন সহ্য করেও নিম্নবর্গ নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সংগ্রামের পথ বেছে নেয় বাধ্য হয়ে। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' মূলত নিম্নবর্গের চেতনার স্বাতন্ত্র্যের দিকটির প্রতি দৃষ্টিপাত করতে গিয়ে লক্ষ করে যে, যখনই নিম্নবর্গ নিজ অধিকার আদায়ের জন্য বিদ্রোহ বা প্রতিবাদের মুহূর্ত তৈরি করে কেবল তখনই উচ্চবর্গীয় চেতনায় ধরা পড়ে নিম্নবর্গের একটি নিজস্ব চেতনা রয়েছে, তাদেরও স্বার্থ রয়েছে, রয়েছে উদ্দেশ্য ও সংগঠন। (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ.৮)

ইতিপূর্বের যাবতীয় আলোচনায় আমরা জেনেছি, নিম্নবর্গের সামাজিক সত্তার উপাদানগুলি তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও অধীনতার চেতনা দ্বারা তৈরি হলেও তা সব ক্ষেত্রে সমান নয়। অর্থাৎ উচ্চবর্গের ক্রিয়া-কলাপ ও চেতনায় প্রধানত আইনের মধ্যে থেকে, আইনের আশ্রয়েই নিম্নবর্গের প্রতি কার্যসিদ্ধি করার প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু নিম্নবর্গের ক্রিয়া-কলাপ আইন সংগত হলেও প্রয়োজন ও অবস্থানুযায়ী প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের রাস্তা বেছে নেওয়ার বিষয়টি উচ্চবর্গের কাছে অনেক সময়ই অপ্রত্যাশিত ও স্বতঃস্ফূর্ত। নিম্নবর্গের মধ্যে একইসঙ্গে উচ্চবর্গের প্রতি আনুগত্য ও বিরোধিতার সম্পর্কের সমন্বয়ে স্বতন্ত্র ও স্বকীয় চেতনার জন্ম হয়। রণজিৎ গুহ ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে তৎকালীন

কৃষক বিদ্রোহের নিরিখে ক্ষমতাকে মূলত দুটি রূপে বিভাজিত করেছেন—আধিপত্য ও অধীনতা হিসেবে। গ্রামশি কথিত ‘হেজেমনি’র ধারণার প্রসঙ্গে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে আধিপত্যের বিস্তারকে রণজিৎ গুহ বুঝিয়েছেন নিম্নলিখিতভাবে।

> ‘… hegemony stands for a condition of Dominance (D), such that, in the organic composition of D, Persuasion (P) outweighs Coercion (C). Defined in these terms, hegemony operates as a dynamic concept and keeps even the most persuasive structure of Dominance always and necessarily open to Resistance.’ (Guha 1997, p. 231)

'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর প্রবক্তারা ঔপনিবেশিক কালখণ্ডে নিম্নবর্গীয় চেতনা বা তাদের স্বকীয়তার যে বৈশিষ্ট্যগুলির কথা বলেছেন তা আসলে তৎকালীন ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্র ভেদে নিম্নবর্গের চেতনার বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের সাধারণ চরিত্রকে অক্ষুন্ন রেখেই এক এক অবস্থায় এক এক রকমভাবে দেখা দেয়।

‘সাবঅলটার্ন স্টাডিজ’-এর লেখকগোষ্ঠী নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চায় যেমন ঔপনিবেশিক কালখণ্ডের কৃষক বিদ্রোহ, দাঙ্গা ও অন্যান্য ঐতিহাসিক ঘটনার দলিল-সাক্ষ্য-প্রমাণের সাহায্য নিয়েছেন, তেমনই আমরাও আমাদের গবেষণার উদ্দেশ্য অনুযায়ী নিম্নবর্গীয় চেতনায় প্রতিবাদ-প্রতিরোধের স্বরূপ সন্ধানে হরিশংকর জলদাসের আখ্যানবিশ্বকে সেই দলিল হিসেবে ব্যবহার করব। সাহিত্যিক হরিশংকর জলদাসও তাঁর কথাসাহিত্যে নিম্নবর্গ ও নিম্নবর্গীয় সমাজকে তুলে ধরতে গিয়ে তাদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের চেতনাকে সাহিত্যের আকল্পের মধ্য দিয়ে একদিক থেকে নিম্নবর্গের ইতিহাসই রচনা করেছেন।

৫.১ কথাবিশ্বে নিম্নবর্গের শ্রেণিচেতনা

অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিম্নবর্গের মধ্যে শ্রেণিচেতনার বিষয়টিও স্পষ্টরূপ লাভ করেছে। সমাজ কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত যে কোনো শ্রেণির মানুষের মধ্যে বিভিন্ন দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ ও নিজ গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার্থে যে অভিন্নতা বোধ গড়ে ওঠে, তাকেই প্রাথমিকভাবে শ্রেণিচেতনা বলা হয়। এককথায় সমশ্রেণির বা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মানুষের মধ্যে অভিন্নতা বোধ ও অন্যান্য শ্রেণি থেকে সেই নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা শ্রেণির একাত্মবোধই হল শ্রেণিচেতনার বৈশিষ্ট্য। তবে মার্কসবাদের শ্রেণিচেতনা হল, বিশ্বাসের একটি সমষ্টি যা কোনো ব্যক্তি তার শ্রেণি বা সমাজে তাদের শ্রেণির কাঠামো এবং শ্রেণির স্বার্থ সম্পর্কে ধারণ করে। কাল মার্কসের মতে, এটি একটি সচেতনতা যা একটি বিপ্লবকে উজ্জীবিত করার চাবিকাঠি। পোস্ট কলোনিয়াল কালখণ্ডের পুঁজিবাদী সমাজে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল শ্রমজীবী মানুষের শ্রেণিচেতনা। এই শ্রেণিচেতনা আসলে সেই শ্রেণির মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িত। অর্থাৎ সংহতি ও ঐক্যবদ্ধ শ্রেণিচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করে যখন এক

শ্রেণির মানুষেরা বুঝতে পারে যে তাদের সমস্যাগুলো একই। 'নিম্নবর্গের ইতিহাস' চর্চায় আমরা জেনেছি নিম্নবর্গীয় চেতনা আসলে বহুবিভক্ত শ্রেণিচেতনার সংমিশ্রণ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য চেতনা হলো নিম্নবর্গের বিরোধী অথবা প্রতিবাদী চেতনা। যে মুহূর্তে আধিপত্যের প্রভাবে তথাকথিত উচ্চবর্গ তাদের স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য নিম্নবর্গের ওপর শোষণ-বঞ্চনা প্রকাশ করে, সেই মুহূর্তে দৈনন্দিন অধীনতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন নিম্নবর্গ বুঝতে পারে তাদের শ্রেণিস্বার্থে আঘাত করা হচ্ছে। তখন নিম্নবর্গের চেতনায় নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে ঐক্য ও সংহতি স্থাপিত হয় এবং তাদের প্রতিবাদী-প্রতিরোধী চেতনা জাগ্রত হয়। কিন্তু এই শ্রেণিবদ্ধ হয়ে আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মুহূর্তটিও স্বল্পস্থায়ী। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত তারা শ্রেণিগত প্রতিরোধের ক্রিয়া-কলাপকে বাস্তবায়িত না করে ততক্ষণ পর্যন্তই নিম্নবর্গের মধ্যে শ্রেণিচেতনার প্রভাব থাকে। (Chaturvedi (ed.) 2000, p.27-28) শ্রেণিচেতনা সম্পর্কে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল,

প্রথমত, কোনো শ্রেণির মধ্যে শ্রেণিচেতনার উন্মেষ হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে একই অন্যায় শোষণের ঘটনার পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে।

দ্বিতীয়ত, কোনো একটি বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণিচেতনা বলে মানুষরা এলোমেলোভাবে সমবেত হতে থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সমস্যা ভুক্তভোগীর অনুযায়ী তাদের নির্বাচন করা হয়। ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারা মিলিত হয়েছে।

তৃতীয়ত, শ্রেণিচেতনা উন্মেষের কোনো পূর্ব-পরিকল্পিত সংগঠন থাকে না। ঘটনার প্রভাবে শ্রেণির মধ্যে এক ধরনের সংহতি ও ঐক্যবোধ গড়ে ওঠে যা একে অপরের সাহায্যের ভিত্তিতে সমস্যা সমাধানে সম্মিলিত পদক্ষেপ গ্রহণ দাবি করে। (কর ১৯৬৫, পৃ.২৩৮)

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায়, গ্রামশি তাঁর 'প্রিজন নোটবুক'-এ সারদিনিয়ার কৃষকদের শ্রেণিচেতনা সম্পর্কে বলেছিলেন যে, একটি নির্দিষ্ট সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মানুষের মধ্যে থেকে শ্রেণিচেতনা সংগঠিত হয়, তা নির্বিচারে বাইরে থেকে আরোপ করার বিষয় নয়। গ্রামশির মন্তব্য স্মরণ রেখে নিম্নবর্গের ইতিহাস সমালোচক ও গবেষক ডেভিড আর্নল্ড কৃষকদের শ্রেণিচেতনার প্রভাব সম্পর্কে তাই জানিয়েছেন-

> 'Class consciousness, he believed, could only come from within a social Group: it could not be arbitrarily imposed from outside. Thus the 'spontaneous' and 'elementary' passions of the subalterns had to be studies, not 'spurned', developed.' (Chaturvedi (ed.) 2000, p. 28)

অর্থাৎ নিম্নবর্গের শ্রেণিচেতনার স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রাথমিক আবেগের বিষয়টি আসলে তাদের বিকাশ ও প্রগতিশীল সমাজ সৃষ্টির একটি ধারণা থেকে উদ্ভূত হয়। সুতরাং শ্রেণিচেতনার উন্মেষ একটি আবেগ ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া হলেও নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে নিম্নবর্গ তাদের ঐক্যবোধকে তাদের প্রতিবাদী চেতনার

অংশ হিসেবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছে। তাইতো নিম্নবর্গ নিজেরাই একটি শ্রেণিচেতনার খন্ডিত উপাদানকে উপস্থাপন করে। লক্ষণীয়, সাবঅলটার্ন স্টাডিজে যে কৃষক বিদ্রোহগুলির সংগঠন, প্রতিস্থাপন প্রতিরোধ ও ব্যর্থতার বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেখানে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই কৃষকদের শ্রেণিচেতনার গুরুত্বকে সামনে রাখা হয়েছে। কারণ নিম্নবর্গের ইতিহাসে কৃষক তথা নিম্নবর্গের প্রতিবাদ-প্রতিরোধী চেতনাকে বুঝতে হলে শ্রেণিচেতনার প্রসঙ্গটিও অঙ্গাঙ্গিভাবে তুলে ধরার প্রয়োজন আছে। হরিশংকরের কথাসাহিত্যে মূলত উপন্যাসে বর্ণিত নিম্নবর্গীয় সমাজে সম্মিলিত প্রতিরোধের প্রাক্‌পর্ব হিসেবে তাদের শ্রেণিচেতনার উন্মেষ লক্ষ করা যায়। আমরা একটি সারণির মধ্য দিয়ে কথাবিশ্বে নিম্নবর্গের শ্রেণিচেতনা জাগরণের বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করছি।

আখ্যানের নাম	**শ্রেণিস্বার্থে আঘাত**	**শ্রেণিচেতনা জাগরণের প্রতিনিধি**	**সম্মিলিত প্রতিরোধের স্বরূপ**
জলপুত্র	শুক্কুর-শশিভূষণ দ্বারা জেলেদের ওপর আর্থিক শোষণ, গঙ্গাকে হত্যা	গঙ্গাপদর নেতৃত্বে জেলেদের মধ্যে শ্রেণিচেতনার জাগরণ	শুক্কুর-শশিভূষণকে মারার পরিকল্পনা ও খামারে আগুন লাগিয়ে দেওয়া
দহনকাল	পাক সৈন্য দ্বারা জেলেদের প্রতি অত্যাচার, ধর্ষণ লুটপাট, শোষণ-পীড়ন	রাধানাথ, হরিদাস, রাধেশ্যামের উদ্যোগে শ্রেণিচেতনার জাগরণ	পাক সেনারা অত্যাচার করতে এলে তাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম।
কসবি	কালু সর্দার-মস্তান দ্বারা পতিতাদের নিপীড়ন, শোষণ-বঞ্চনা	কৈলাস দ্বারা পতিতাদের মধ্যে শ্রেণিচেতনা জাগরণের প্রয়াস	বনানী, জুলিয়েটদের সাপ্তাহিক ছুটি ঘোষণা, দেবাযানীর কালুকে হত্যা
রামগোলাম	কর্পোরেশন দ্বারা মেথরদের সংরক্ষিত চাকরি উন্মুক্ত করে দেওয়া	রামগোলাম ও কার্তিক মেথরদের ঐক্যবদ্ধ করে	কর্পোরেশন ঘিরে চারদিন ব্যাপী অবস্থান বিক্ষোভ ও ধর্মঘট।
মোহনা	পাল রাজাদের বারংবার কৈবর্ত রাজ্য দখল করার চেষ্টা, লুঠপাট-ধর্ষণ	ভীমসেনের ডাকে নিম্নবর্গের মধ্যে শ্রেণিচেতনার জাগরণ	রাজ্যকে আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে ভীমের সৈন্য দলে যোগদান ও যুদ্ধ

কুন্তীর বস্ত্রহরণ	চেয়ারম্যান আবুলের কুমোরদের প্রাচীন শ্মশান আত্মসাৎ করার ইচ্ছে	কুন্তীর নেতৃত্বে কুমোর, মালো, নমঃশূদ্রদের মধ্যে শ্রেণিচেতনা	পাড়ায় পাড়ায় প্রতিবাদ মিছিল ও স্লোগান দেওয়ার পরিকল্পনা
সুখলতার ঘর নেই	ষড়যন্ত্র করে পিতাকে খুন করে পঞ্চুর সর্দার হওয়া ও মাৎস্যান্যায় রূপ শোষণ	পঞ্চু সর্দারের অন্যায়ের বিরুদ্ধে মৎস্যসমাজের ঐক্যবদ্ধ হওয়া	আঠারো দিন ব্যাপী দুই পক্ষের মহাসংগ্রাম ও পঞ্চুর বিনাশ

তবে কথাবিশ্বে নিম্নবর্গ যে প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রতিবাদী, এমনটা নয়। পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদের নিষ্ক্রিয়তা ও প্রতিবাদহীনতাও উঠে এসেছে। আবার উচ্চবর্গের ক্ষমতার কাছে নিম্নবর্গের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ ব্যর্থও হয়েছে। আলোচনার এই পরিসরে আমরা হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যে বর্ণিত নিম্নবর্গের প্রতিবাদ-প্রতিরোধকে দেখে নেওয়ার মধ্য দিয়ে নিম্নবর্গের স্বতন্ত্র-স্বকীয় চেতনাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।

৫.২ কথাবিশ্বে নিম্নবর্গের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের স্বরূপ সন্ধান

বাদ ও প্রতিবাদ বিষয়টি একে অপরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সমাজের যেখানেই অন্যায় শোষণ-বঞ্চনা দেখা যায়, সেখানেই প্রতিবাদ-প্রতিরোধ উঠে এসেছে। হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে নিম্নবর্গের প্রতি ঘটে যাওয়া নানাবিধ শোষণ-বঞ্চনার রূপ আমরা ইতিপূর্বের অধ্যায়ে অনুধাবন করেছি। সেই শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের মধ্যে কখনো একক প্রতিবাদ বা কখনো সম্মিলিত প্রতিরোধকে লক্ষ করা গিয়েছে। কথাবিশ্বে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের এই বিবিধ রূপ উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নিম্নে আলোচনা করা হল।

৫.২.১ একক প্রতিবাদের নানাদিক

‘দহনকাল’ উপন্যাসে হরিদাসের সহপাঠী সুধীর লম্পট ধরনের বলে হরিদাসকে সে নানা কারণে বিরক্ত করে। এরকমই পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোনোর দিন দাদুর দেওয়া নতুন জামার কলার সুধীর হাতের মুঠিতে খামচে ধরে ঝাঁকাতে থাকে। হরিদাস দাদুর আশীর্বাদস্বরূপ জামাটির এরকম লাঞ্ছনা দেখে সুধীরকে তার জামাটি ছাড়তে বলে। কিন্তু নাছোড়বান্দা সুধীর উল্টে হরিদাসকে মেরেছে-

> ‘সুধীর এর কথায় হরিদাসের ভেতর হঠাৎ এক ধরনের শক্তি জেগে উঠল। তার স্নায়ুতন্ত্র চঞ্চল হয়ে উঠল। দুই হাতের থাবা দিয়ে সুধীরের বুকে একটা জোরে ধাক্কা দিল হরিদাস। সুধীর প্রস্তুত ছিল না। সে জানতো, ম্যাদামারা হরিদাস হাজার অত্যাচারেও রা কাড়বে না।’ (জলদাস ২০১০, পৃ. ৮৫)

উল্লেখ্য, ‘হরিদাস হাজার অত্যাচারেও রা কাড়বে না’- নিম্নবর্গের প্রতি উচ্চবর্গের এ ধরনের মনোভাবই উচ্চবর্গীয় চিন্তা-চেতনা থেকে নিম্নবর্গীয় চেতনাকে আলাদা করে। উচ্চবর্গীয় চেতনা আধিপত্য ভিত্তিক, অন্যদিকে অধীনতার চেতনা নিম্নবর্গের বৈশিষ্ট্য। ফলে সুধীরের মনে হয়েছে হরিদাস প্রতিবাদে অক্ষম। কিন্তু যে মুহূর্তে হরিদাস সুধীরের বুকে ধাক্কা মারে সেই মুহূর্ত থেকে সুধীরের প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হয়েছে হরিদাস। সুধীরের কাছে হরিদাসের প্রতিবাদ করা যতটা না অপমানের ততটাই বিস্ময়ের।

> ‘তার চোখে যতটা না অপমান, তার চেয়ে অধিক বিস্ময়। কী অবাক কান্ড! হরিদাস তাকে ঠেলা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছে! আর সে এখনো মাটিতে পড়ে আছে।’ (জলদাস ২০১০, পৃ. ৮৫)

আমরা লক্ষ করলাম, নিম্নবর্গীয় চেতনায় প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের বৈশিষ্ট্য উচ্চবর্গের কাছে তাদের স্বতন্ত্রতাকে চিহ্নিত করে। পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর ‘More on Modes of power and the peasantry’ প্রবন্ধে জানিয়েছেন-

> ‘The revolt is only a moment in the historical process of domination/ resistance.’
> (Guha (ed.) 1983, p.339)

আসলে উচ্চবর্গের বিপরীতে নিম্নবর্গের চেতনাকে সাহিত্যের নিরিখে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে দেখতে গেলে কথাবিশ্বে অভিব্যক্ত প্রভুত্ব-অধীনতার দ্বান্দ্বিক সম্পর্কগুলি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। যেমন, আলোচ্য উপন্যাসে হরিদাস ও সুধীরের দ্বন্দ্বের ঘটনাটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলেও হরিদাসের প্রতি সুধীরের মনোভাব প্রভুত্ব-অধীনতার দ্বান্দ্বিক সম্পর্কটিকে স্পষ্ট করেছে। শুধু তাই নয়, আলোচ্য উপন্যাসে নিকুঞ্জ বহদ্দার যখন তার পাউন্যা নাইয়া পরিমলকে গোঁজ পুঁতে দেওয়ার নাম করে দিনের পর দিন খাঁটিয়ে নেয়, তখন সংসারের অভাব ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সে নিকুঞ্জের বিরুদ্ধে নিজের বাড়িতে সালিশি সভা ডাকে। আমরা জানি নিকুঞ্জ একজন সর্দার হওয়ার পাশাপাশি সে গ্রামের মান্যগণ্য সর্দারও। তার বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস জেলেপাড়ার কারো নেই। কিন্তু পরিমল সাধারণ পাউন্যা নাইয়া হয়ে তার বিরুদ্ধে সালিশি ডাকার দুঃসাহস দেখিয়েছে। তাই সভায় উপস্থিত সকলের সামনে এসে সে অভিযোগ জানাতে পারে-

> ‘আঁর বহদ্দার নিকুঞ্জ কাকা জাল বোয়াইতো নো দের।’ (জলদাস ২০১০, পৃ. ৯৪)

পরিমলের এই সালিশি প্রতিবাদের জন্য তৈরি ছিল না নিকুঞ্জ। কারণ তার মতে পাউন্যা নাইয়া হল তার হুকুমের গোলাম। সে যেমন ভাবে তাকে চালাবে সে সেই মতো চলবে। নিকুঞ্জের মতে,

‘পাউন্যা নাইয়া মানে আঁর পইরর মাছ।... আঁল্লাই সালিশ!’ (জলদাস ২০১০, পৃ. ৯৪)

পাউন্যা নাইয়াকে ‘পইরর মাছ’ বলে অভিহিত করার মধ্যে উচ্চবর্গের আধিপত্যের চেতনা ফুটে উঠেছে। কিন্তু পাউন্যা নাইয়ার এ ধরনের অপমান মেনে নিতে পারেনি আরেকজন পাউন্যা নাইয়া রাধানাথ। নিজেকে অধীনস্ত হিসেবে মানতে নারাজ রাধানাথ প্রতিবাদী সত্তায় বলে ওঠে-

‘তুঁই ঠিগ নো-কত্ত সর্দার। পাউন্যা নাইয়া নো অইলে বহদ্দার অলেও জাল বয়াইত নো পাইত্তো।’

(জলদাস ২০১০, পৃ. ৯৪)

আসলে অন্যায় অযৌক্তিকতার বিপরীতে যৌক্তিক বিচারে সত্য উদঘাটন প্রক্রিয়াই প্রতিবাদের প্রাথমিক শর্ত। ‘দহনকাল’ উপন্যাসে একাধিকবার রাধানাথের মুখ থেকে এ ধরনের যৌক্তিক সত্য উদঘাটিত হয়েছে, যার ফলে তাকে তথাকথিত উচ্চবর্গের রোষের মুখেও পড়তে হয়েছে বারবার। নিকুঞ্জের অন্যায় যুক্তিকে খণ্ডন করে রাধানাথ নিকুঞ্জর রোষের কারণ হয়েছে। নিকুঞ্জ হুমকি দিয়েছে-

‘রাধানাইথ্যা, তইলে তুই বউত্ কাবিল অই উঠ্যস। লিডার হইয়স। ভালা ভালা। চোখ-কান খোলা রাইস।’

(জলদাস ২০১০,পৃ. ৯৫)

কিন্তু রাধানাথও দমে যাওয়ার পাত্র নয়। সে প্রতিবাদী। সাহস সঞ্চয় করে তাই সে বলে-

‘পাউন্যা নাইয়াও মানুষ। অত্যাচার নো গইয্যো। হিতারার মিক্কেও ঈশ্বর আছে।’ (জলদাস ২০১০, পৃ. ৯৫)

তবে শুধু নিকুঞ্জ সর্দারের বিরুদ্ধেই নয়, জেলেপাড়ার আব্দুল খালেক মেম্বারের অন্যায়ের দাবির বিরুদ্ধেও রাধানাথকে প্রতিবাদ করতে দেখা গিয়েছে। আলোচ্য উপন্যাসে দেখা যায়, উত্তর পতেঙ্গার জেলেপাড়ায় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন করার সময় সেখানে উপস্থিত হয় ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার আব্দুল খালেক। হঠাৎ সে দাবি করে জেলেদের জন্য তৈরি সমবায় সমিতিতে সভাপতি হিসেবে তার নাম যেন থাকে। মেম্বারের আচরণ ও স্বার্থ সম্পর্কে অবগত উপস্থিত সকল জেলেরা বিস্ময়ে অবাক হলেও রাধানাথ মেম্বারের এই অন্যায় দাবিকে মানতে পারেনি।

‘জাইল্যা সমিতির সভাপতি অইবেন, সাহায্য লইতেন নো। হিয়ান আঁরা বিশ্বাস গরি কেত্রন গরি?’

(জলদাস ২০১০, পৃ. ১১৯)

রাধানাথকে এজন্য খালেকের রোষের মুখে পড়তে হয়েছে। খালেকের দাবিকে অযৌক্তিক প্রমাণ করার চেষ্টায় সে রাধানাথকে হুমকি দেয়-

‘হুন্ রাধানাইথ্যা, বেশি সিয়ানা নো অইস। বিপদ নো ডাকিস।’ (জলদাস ২০১০, পৃ. ১১৯)

অন্যদিকে উপন্যাসে ঘটনাক্রমে রামহরির সঙ্গে অংশীদারি ব্যবসায় নেমে জালাল মেম্বার রামহরির সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাকে পথের ভিখারী করে ছেড়েছে। শুধু তাই নয়, রামহরিকে তার নিজেরই

নৌকার বড়োমাঝি হিসেবে নিযুক্ত করে জালাল বঞ্চনার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। সর্বস্ব হারিয়ে রামহরি প্রতিশোধস্পৃহায় চিৎকার করে বলে উঠেছে-

> 'জালাইল্যা আঁই তোর বাপের নাম ভুলাই দিয়ম' (জলদাস ২০১০, পৃ.১৩২)

রামহরি শুধু মুখেই বলেনি, কাজে করে দেখিয়েছে। জালাল যে নৌকায় রামহরিকে বড়োমাঝি নিযুক্ত করেছিল, সেই নৌকার পে-না অর্থাৎ ছিদ্রগুলি সে খুলে দিয়েছে।

> 'সবাই ঘুমিয়ে পড়লে একটা হাতুড়ি ও একটা বড়ো পেরেক খোলে রামহরি। একটা একটা করে পে-না হাতুড়ি ঠুকে ঠুকে বের করে দেয় সে। গল গল করে সমুদ্রজল ঢুকতে থাকে সেই ছিদ্র দিয়ে'। (জলদাস ২০১০, পৃ. ১৩৩)

ফলে পরদিন সকালে দেখা গেল, রামহরির চোখের সামনে গাউররা ভেসে যায়। নৌকার সঙ্গে রামহরিও ঢেউয়ে ঢেকে গিয়ে জলের তলায় হারিয়ে যায়। রামহরি প্রতিশোধ নিতে গিয়ে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে। শোষণ-বঞ্চনার যোগ্য জবাব দিতে গিয়ে একজন নিম্নবর্গ যে মৃত্যুবরণ করতে পারে তার প্রমাণ রামহরি–যা একই সঙ্গে নিম্নবর্গীয় চেতনার সক্রিয়তা এবং প্রতিশোধজনিত প্রত্যাঘাতও। এক্ষেত্রে সমালোচক ডেভিড আর্নল্ডের মন্তব্য-

> 'Subaltern ideology, especially as represented by religion, one of its principal forms, was necessarily consistent with, or alpppropriafe to, the subalterns' own material existence'.
> (Chaturvedi (ed.) 2000, p. 32)

আসলে নিম্নবর্গের আদর্শ মূলত ধর্ম দ্বারা প্রদর্শিত হলেও এটি তাদের একটি আদর্শগত ধরণ যা বারবার প্রয়োজন অনুরূপ কাজ করে বা নিম্নবর্গের নিজস্ব চেতনার উপাদানগত অস্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। রামহরির ক্ষেত্রেও নিজস্ব চেতনার অস্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে প্রাণের বিনিময়ে প্রতিশোধস্পৃহাকে সার্থক করার মধ্য দিয়ে।

বঞ্চনা-অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের এ ধরনের প্রতিক্রিয়ার উদাহরণ আমরা 'অর্ক' উপন্যাসেও লক্ষ করি দিবাকরের মধ্য দিয়ে। জানা যায়, উত্তর পতেঙ্গা জেলেপাড়ার ছোবান মেম্বার সরকারি প্রতিনিধি। জেলেদের জন্য যাবতীয় সরকারি সাহায্য ও অনুদান মেম্বার দ্বারা জেলেদের কাছে পৌঁছায়। স্কুলে দিবাকরের রেজিস্ট্রেশনের জন্য যে টাকার প্রয়োজন তা ছোবানের কাছে সরকারি অনুদান হিসেবে চাইতে গেলে ছোবান টাকা দিতে অস্বীকার করে। বলে, তার কাছে রাজকোষ বা গুপ্তধন নেই যে, চাইলেই পাওয়া যাবে। ছোবানের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে দিবাকরের প্রতিক্রিয়া-

> 'আপনার কাছে টাকা চাইতে আসি নাই।...দরিদ্র মানুষদের সাহায্যের জন্য সরকারি টাকা আসছে আপনার কাছে। ওই টাকায় আমাদের হক আছে।' (জলদাস ২০১৭, পৃ. ৯১)

আবার ‘রামগোলাম’ উপন্যাসে মেথর সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে রামগোলাম ও কার্তিক চরিত্রটি প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। মেথর ও মেথর সমাজের প্রতি অন্যায় বঞ্চনার প্রতি একাধিক বার তাদের প্রতিবাদ লক্ষ করা যায়। উপন্যাসে দেখি কর্পোরেশনের তরফ থেকে জানানো হয় মেথরদের জন্য নির্ধারিত চাকরি এবার থেকে সকল জাতপাত নির্বিশেষে উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। এই ঘোষণায় মেথরদের মধ্যে অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতার প্রশ্ন ওঠে। কর্পোরেশনের এধরনের অন্যায় ঘোষণার বিরুদ্ধতা করতে মেথরপট্টির সর্দার গুরুচরণ, রামগোলাম ও কার্তিক বড়ো সাহেবের সঙ্গে কথা বলার জন্য কর্পোরেশনে পৌঁছায়। কিন্তু বড়ো সাহেবের সাকরেত ইউসুফ তাদের বড়ো সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে বাধা দেয়। গুরুচরণ বাধা না দিতে অনুরোধ করলে ইউসুফ গর্জে ওঠে। কার্তিক ইউসুফের কথায় প্রতিক্রিয়া জানায়- ‘করবা কী মানে জোর করে ঢুকব।’ (জলদাস ২০১২, পৃ.৮৮) কার্তিকের ‘জোর করে ঢুকব’ বলার মধ্যে অধিকার আদায় করার মানসিকতা রয়েছে। নিম্নবর্গীয় চেতনায় জোর করে বা বাধ্য করার বৈশিষ্ট্য না থাকলেও এক্ষেত্রে কার্তিকের চেতনায় বিনয় বা নিষ্ক্রিয়তা লক্ষ করা যায় না। বরং আধিপত্যের অন্যতম শর্ত জোর করার পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে কার্তিক। তাই

> ‘...কার্তিক হুংকার দিয়ে ওঠে। বলে, ‘কী করে বাধা দাও দেখি?’ বলে দরজার দিকে ছুটে আসে কার্তিক।’
>
> (জলদাস ২০১২, পৃ. ৮৮)

কার্তিকের হুংকারে বড়ো সাহেবের সম্বিত ফিরলে তিনি তাদের তিনজনকে ভেতরে ডাকেন। অর্থাৎ প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রমাণিত নিম্নবর্গের কণ্ঠস্বর তখনই কার্যকর হয় যখন তারা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। তাই নিম্নবর্গের ঐতিহাসিকরা প্রতিবাদকে নিম্নবর্গীয় চেতনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করেছেন।

অন্যদিকে মেথরদের প্রতিবাদের জবাব দিতে কর্পোরেশনের বড়োবাবু ছালাম সাহেব ইচ্ছে করে ফিরিঙ্গিবাজার মেথরপট্টির গা লাগিয়ে কসাইখানা নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। এই সিদ্ধান্তের পেছনে অন্যতম কারণ হল, তাদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করা এবং কসাইখানার দুর্গন্ধে তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলা। বড়োবাবু আবদুস ছালামের এই ঘৃণ্য উদ্দেশ্যের কথা মেথরদের কাছে পরিষ্কার হওয়ার পর তারা ঠিক করে, ঘরে বসে আফসোস না করে প্রতিবাদের পথ অবলম্বন করতে হবে। প্রতিবাদের ভাবনা নিয়ে তারা বড়ো সাহেবের কাছে কসাইখানা বন্ধের আর্জি জানালেও বড়ো সাহেব তার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। মেথররা ছালাম সাহেবকে আবারও অনুরোধ করলে পাশ থেকে যোগেশ বড়ো সাহেবের সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে সর্দার রামগোলামকে বোঝায়। যোগেশের এই চাটুকারিতা ও বিশ্বাসঘাতকতায় বেজায় চটে যায় কার্তিক। তার তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা যায়,

> ‘চামচার বাচ্চা, বেহেনচোদ। চামচাগিরি করস খানকির পোলা? বলতে বলতে কার্তিক যোগেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অতর্কিত আক্রমণের ফলে ধপাস করে মেঝেতে পরে গেল যোগেশ। বুকের ওপর বসে অবিরাম চড়-ঘুষি চালিয়ে যেতে লাগল কার্তিক।’ (জলদাস ২০১২, পৃ.১৫৪)

রণজিৎ গুহ ঔপনিবেশিক ভারতে ১৭৮৩-১৯০০ সাল পর্যন্ত কালখণ্ডে ঘটে যাওয়া কৃষক বিদ্রোহগুলি পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন,

> ‘The fact that the subalterns and the subordinate classes have resisted oppression thought-out history has enough empirical evidence.’ (Mannathukkaren 2022, p. 32-33)

আসলে নিম্নবর্গের ইতিহাস প্রতিষ্ঠিত অভিজাতদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অপরিবর্তনীয় ধারণা। সাবঅলটার্ন গোষ্ঠীর আলোচকেরা ঔপনিবেশিক কৃষক বিদ্রোহের উপর ভিত্তি করে কৃষক চৈতন্য বা তাদের প্রতিবাদ, সংগঠন, প্রতিরোধ, রাজনীতির কথা তুলে ধরতে গিয়ে উল্লেখিত আধিপত্যের বিরুদ্ধে কৃষকদের প্রতিরোধের যে অপরিবর্তনীয় ধারণার কথা ব্যক্ত করেছেন তা আসলে কৃষক তথা নিম্নবর্গেরই স্বতন্ত্র চেতনার সরব ঘোষণা। নিম্নবর্গীয় চেতনায় প্রতিবাদী সত্তার জাগরণ হঠাৎ করে ঘটে না। দিনের পর দিন আধিপত্যের পদতলে থেকে অধীনতার অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নেয় নিম্নবর্গের প্রতিক্রিয়া দেখানর সাহস, জেগে ওঠে প্রতিশোধস্পৃহা এবং সর্বোপরি শ্রেণিচেতনার উন্মেষের ফলে গড়ে ওঠে বৃহত্তর প্রতিরোধ বা বিদ্রোহ।

অন্যদিকে ‘অর্ক’ উপন্যাসে দেখি ছোবান মেম্বার ক্ষমতার অপব্যবহার করে জেলেদের প্রতি। ভারতে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার প্রভাব বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে পড়লে ছোবান মেম্বারের মতো সাম্প্রদায়িক মানুষেরা হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতিকে নষ্ট করার চেষ্টা করছে। জেলেদের থেকে মাছ কেড়ে নিয়েছে। গরীব জেলেদের জন্য বরাদ্দ সরকার অনুমোদিত সাহায্য থেকে বঞ্চিত করেছে। আবার কিছুক্ষেত্রে সেই অনুদানের কৃতিত্ব সে নিজে নিয়ে জেলেদের কাছ থেকে বিনামূল্যে মাছ ও সুযোগ সুবিধা নিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের আবহে পাক সেনা দ্বারা যখন উত্তর পতেঙ্গা গ্রাম অবরুদ্ধ তখন সাম্প্রদায়িক মানসিকতার ছোবান রাজাকার ও পাকসেনাদের জেলেপাড়ার প্রতি লেলিয়ে দেয়। দেখা যায় মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার পর একদিন রহমালি বাড়িতে এসে জানতে পারে ছোবান মেম্বার তার মায়ের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। রহমালিকে দেখে সুবল জ্যাঠা কাতর কণ্ঠে বলে ওঠে-

> ‘আমাদের বাঁচাও বাবা। আমাদের মেইয়েদের ইজ্জত শরমান রক্ষা কর।’ (জলদাস ২০১৭, পৃ. ১০৯)

রহমালি সকলের কাছ থেকে পাক সৈন্য ও ছোবান মেম্বারের অত্যাচার বঞ্চনা ও নিপীড়নের কথা শুনে জেলেদের সংযত ও মানসিকভাবে ধৈর্য ধরার পরামর্শ দেয়।

> ‘পরদিন সকালে পতেঙ্গা গ্রামের মানুষেরা জানল- রাতের আঁধারে কে বা কারা শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ছোবান মেম্বার কে খুন করেছে। পিস্তলের গুলিতে মেম্বারের মাথাটা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়ে গেছে।’ (জলদাস ২০১৭, পৃ. ১১০)

এ পর্যন্ত আমরা দেখলাম নিম্নবর্গের প্রতিবাদের চূড়ান্ত পর্যায়ে তারা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে কখনো একত্রিত হয়ে আবার কখনো একক চেষ্টায় শোষণ বঞ্চনাকারীকে হত্যা করেছে। এই হত্যার পেছনে নিম্নবর্গীয় চেতনায় বৃহত্তর পরিসরে রূপান্তর ঘটানোর প্রচেষ্টা লক্ষণীয়।

নিম্নবর্গের ‘insurgent consciousness’ যে শুধু কৃষক বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী কৃষকদের মধ্যে বা পরবর্তীকালে নিম্নবর্গের মধ্যে দেখা গিয়েছে তা নয়, প্রাচীন শাস্ত্র বা পুরাণেও অন্যায়-বঞ্চনার বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের প্রতিবাদ-প্রতিক্রিয়া ধ্বনিত হয়েছে। এর উদাহরণস্বরূপ আমরা পেয়ে যাই হরিশংকরের ‘একলব্য’ উপন্যাসটিকে। মহাভারতের আদি খণ্ড অবলম্বনে রচিত একলব্য চরিত্রকে কেন্দ্র করে নিম্নবর্গীয় চেতনার প্রকাশ লক্ষণীয়। বিশেষ করে কর্ণ ও একলব্য চরিত্রদুটিকে আমরা স্বমহিমায় উপস্থিত হতে দেখেছি উপন্যাসে। জন্মের চেয়ে কর্মকে প্রাধান্য দেওয়া দুজন ব্যক্তিত্ব যেভাবে সমাজ ও ক্ষমতাকে উপেক্ষা করে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার মধ্য দিয়ে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে।

আলোচ্য উপন্যাসে লক্ষ করি, কর্ণ দ্রোণাচার্যের কাছে ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করার ইচ্ছে প্রকাশ করলে জাতপাতের কথা বলে তিনি কর্ণকে ব্রহ্মাস্ত্র বিদ্যাদানে অসম্মত হলেন। বর্ণের নিচতাই এর প্রধান কারণ। তাই দ্রোণ কর্ণকে জানায় যে, সুতপুত্রের এই অস্ত্র পাওয়ার অধিকার নেই। আমরা জানি কর্ণকে আজন্ম নিচুজাতের অপমান সহ্য করতে হয়েছে। তাই বারবার কর্ণকে অপমানের জবাব দিতে হয়েছে প্রতিবাদী হয়ে। দ্রোণের অপমানের জবাবে কর্ণের প্রতিক্রিয়া,

> ‘আমার মা রাধা। রাধা ব্রাহ্মণ কন্যা। সবাই আমাকে রাধেয় বলে। মায়ের দিক থেকে হলেও আমি ব্রহ্মাস্ত্র পেতে পারি।’
> (জলদাস ২০১৬, পৃ. ৮২)

কর্ণের যুক্তি-তর্ক প্রতিবাদ কোনো কিছুতেই দ্রোণ তার সিদ্ধান্ত থেকে সরলেন না দেখে কর্ণ নিজের লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য অবিরাম সংগ্রাম করেছে। অভিমানে ক্ষুব্ধ কর্ণ নিজের আসল পরিচয় গোপন করে ব্রাহ্মণ পরিচয়ে গুরু পরশুরামের কাছে শিক্ষা লাভ করেছে। শুধু কর্ণ নয়, হীনবংশজাত নিষাদপুত্র বলে দ্রোণ একলব্যকেও একইভাবে অস্ত্রশিক্ষা থেকে বঞ্চিত করেছেন। কর্ণের মতো একলব্যও হার মানেনি। গভীর জঙ্গলে দ্রোণের মাটির মূর্তি স্থাপন করে একাগ্র অধ্যাবসায়ে অস্ত্রশিক্ষা অর্জন করে পারদর্শী হয়ে উঠেছে সে। কিন্তু এই খবর দ্রোণের কাছে পৌঁছালে সে কৌশলে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ একলব্যের বুড়ো আঙুল কেটে নিয়েছেন যাতে ভবিষ্যতে অর্জুনের সমকক্ষ সে হতে না পারে। এধরনের অমানবিক নির্মম বঞ্চনায় একলব্য মর্মাহত ও হতবাক। এই করুণ পরিণতি স্বচক্ষে দেখে অন্য আরেকজন বীর কর্ণ নিজেকে ধরে

রাখতে পারেননি। গুরু দ্রোণের এই আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে সে। তার মৌখিক প্রতিক্রিয়ায় শোনা যায়-

> ‘বাঃ! বাঃ! কী চমৎকার বিচার আপনার গুরুদেব! ...আপনি না নিজেকে সত্যপ্রিয় ন্যায়বিচারক বলে দাবি করেন?... যে তরুণটিকে আপনি হীন বংশ বলে একদিন দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন,একদিনের জন্য যাকে আপনি অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেননি, সেই তরুণটির কাছ থেকে দক্ষিণার দোহাই দিয়ে তার দামি প্রত্যঙ্গটি কেড়ে নিলেন?
>
> (জলদাস ২০১৬, পৃ. ১৪৬)

গুরুদেবের সঙ্গে অর্জুনকেও হুমকি দিয়েছে কর্ণ। কারণ সে মনে করে অর্জুনের শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর হয়ে ওঠার ইচ্ছেই সর্বনাশের মূল কারণ।

কর্ণ ও একলব্যের হীনবংশজাত সামাজিক অপমান কোনোদিনই তাদের পিছু ছাড়েনি। কিন্তু এইসব উপেক্ষা করে তারা জন্মের চেয়ে কর্মকে প্রাধান্য দিয়ে একসময় ধনুর্ধর ও বীর বলে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে। যদিও এক্ষেত্রেও তাদের প্রতিষ্ঠিত হয়েছে উচ্চবর্গীয় চেতনার বিপরীতে। দিনের-পর-দিন জাতপাতজনিত অন্ত্যজ শ্রেণির অপমানে বঞ্চিত হয়ে অধীনতার অভিজ্ঞতায় কর্ণ ও একলব্য বেড়ে উঠেছে। এতদিনের অপমান বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মতো সামর্থ্য তাদের তৈরি হয়েছে যার ফলস্বরূপ কর্ণ ও একলব্যের প্রাথমিকভাবে মৌখিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ করি।

প্রতিবাদের ভিন্ন ধরনও দেখা গিয়েছে ‘প্রস্থানের আগে’ উপন্যাসে। দেখা যায়, জেলেসমাজের প্রথম শিক্ষিত এম.এ পাস শিবশঙ্কর সাজনমেঘ হাই স্কুলের হেডমাস্টার পদে আসীন হয়। তার দক্ষতা, যত্নে ও কর্মক্ষমতায় স্কুলটি খ্যাতি অর্জন করে। স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা চলাকালীন কমিটির সভাপতি হায়দার সাহেবের ভাগ্নে সেকেন্দার গণিত পরীক্ষায় নকল করতে গিয়ে ধরা পড়লে শিবশঙ্কর কর্তব্য অনুযায়ী সেকেন্দারের পরবর্তী পরীক্ষা বাতিল করে। কিন্তু হায়দার সাহেব রেজাল্ট বেরোনোর সময় ভাগ্নের প্রমোশন চাইলে শিবশঙ্কর আপত্তি জানায়। শিবশঙ্করের আপত্তিতে বেজায় চটে যান হায়দার সাহেব। এককথায় দুইকথায় শিবশঙ্করের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন তিনি। জাতপাত তুলে নানাভাবে অপমানিত হয় শিবশঙ্কর। হায়দার সাহেবের বক্তব্য-

> ‘জাইলার পোলা তুমি। কী করে কী করে এমএ পাস করেছ। পাশ করলে কি হবে, চাকরি পেতে নাকি! ছোটোজাতের লোকদের আজকাল চাকরি দেয় নাকি কেউ? আমরা উদার বলে দিয়েছি।’ (জলদাস ২০১৯, পৃ.২২০)

এই বলে শিবশঙ্করকে হুমকি দিয়েছেন তার ভাগ্নের প্রমোশন দেওয়ার জন্য। শিবশঙ্করের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন উঠলে সে চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়েছে।

> ‘টেবিলে রেজিগনেশন লেটার চাপা দিয়ে সেই বিকেলে সাজনমেঘ হাইস্কুল থেকে বেরিয়ে এসেছিল শিবশঙ্কর।’

(জলদাস ২০১৯, পৃ.২২০)

হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যে প্রতিবাদ শুধু ব্যক্তিবিশেষ বা অন্যায়-বঞ্চনা বিশেষে উঠে আসেনি। নিম্নবর্গ প্রতিবাদ করেছে সমগ্র সমাজের বিরুদ্ধেও। কখনো কখনো তা কর্মের মধ্যে দিয়ে কখনো যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে। তাইতো ‘কোটনা’ গল্পে দেখি মুচি রামদুলাল হাটে বাজারে লাথি-ঝাঁটা খেয়ে উপলব্ধি করে নিম্নবর্গীয় জীবন কতটা অপমানের। ফলে একজন পিতা হিসেবে সে তার ছেলের জীবন সুরক্ষিত করতে চেয়েছে। সমাজের কাছে মুচি বলে প্রতি পদক্ষেপে যে অপমান ও যন্ত্রণা তাকে সহ্য করতে হয়েছে তার প্রতিবাদ স্বরূপ সে তার ছেলে অশোককে হালিমুন্নেছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়েছে। সন্তানকে শিক্ষিত করার মধ্য দিয়ে সমাজের প্রতি প্রতিবাদ ঘোষণাই শুধু নয়, ছেলের পদবী ‘দাস’ থেকে ‘চৌধুরী’-তে পরিবর্তন করার মধ্যেও রয়েছে তথাকথিত ভদ্রসমাজের প্রতি প্রতিবাদ। তাইতো হঠাৎই একদিন পিতা রামদুলাল স্কুলের হেডমাস্টারকে অনুরোধ করে,

> ‘আমার ছেলের পদবী বদলাতে চাই।’ (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ১৮)

নিম্নবর্গীয় প্রতিবাদের এই ভিন্নতা সম্পর্কে পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন,

> ‘লোকমানসের কিছু কিছু উপাদান যেমন আশ্চর্য রকমের শক্তিশালী বিশেষ করে এক ধরনের স্বাভাবিক নীতিবোধ কাজ করে তার মধ্যে যা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম, ন্যায়শাস্ত্র বা আইনের তুলনায় অনেক সহজ অথচ গভীর এবং দীর্ঘস্থায়ী। দৈনিক জীবনযাত্রা নানা পরিবর্তন ঘটলেও স্বাভাবিক ন্যায়অন্যায় বোধ অক্ষুন্ন থাকে। এমনকি নতুন নতুন পরিস্থিতিতে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের নানা অভিনব পন্থা জন্ম দিতে সক্ষম।’ (ভদ্র (সম্পা.), ১৯৯৮, পৃ.৪)

নিম্নবর্গ তাদের নিজস্ব বাস্তব অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী সামাজিক উপাদান এর কিছু কিছু অংশই গ্রহণ করে, ফলে সামাজিক মানুষ হিসেবে সমাজ বিন্যাসের সার্বিক প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রের মধ্যে এ ধরনের উচ্চ-নীচ স্তরভেদ দেখা যায়। আমরা জানি, যে কোনো শ্রেণিবিভক্ত সমাজে প্রভুত্ব ও অধীনতার সম্পর্কটি মোটের উপর বিরোধিতারই সম্পর্ক। সুতরাং প্রায়শই উচ্চবর্গীয় চেতনার সঙ্গে নিম্নবর্গীয় চেতনার এক ধরনের বৈরিতা বা বিরুদ্ধতা সৃষ্টি হয়। এই বিরুদ্ধতা থেকে জন্ম নেয় নিম্নবর্গীয় প্রতিবাদ-প্রতিরোধের চেতনা যা অনেকক্ষেত্রেই ক্ষমতাশীল বা প্রভাবশালী শ্রেণির কাছে বিপদ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়।

কথাবিশ্বের নিরিখে তাই দেখা গেল, নিম্নবর্গীয় সমাজের অন্তশ্রেণি ও আন্তঃশ্রেণির দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ফলে বারবার শোষিত হয়েছে মানুষ। দিনের পর দিন বঞ্চনা সহ্য করার পর নিজ অস্তিত্বকে বজায় রাখার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্গের মানুষরা উচ্চবর্গীয় আদর্শের মুখোশ খুলে তা প্রত্যাখ্যানও করেছে। সমালোচক ডেভিড আর্নল্ড তাই বলেছেন-

> 'The mental tenacity of the subalterns which made them slow to take up revolutionary ideas, also made them resistant to attempts to introduce or impose new hegemonic ideas.'
>
> (Chaturvedi (ed.) 2000, p. 32)

অর্থাৎ নিম্নবর্গের মানসিক গড়ন এমন যা তাদের বৈপ্লবিক আদর্শগত সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব করায় এবং পাশাপাশি তাদের মধ্যে নতুন প্রতিবাদ-প্রতিরোধের বিভিন্ন পন্থার সৃষ্টি করে। আলোচ্য গল্প-উপন্যাসে আমরা লক্ষ করলাম, নিম্নবর্গের অন্যায়ের তৎক্ষণাৎ প্রতিক্রিয়া করলেও সেই প্রতিক্রিয়া কার্যকর হতে সময় লেগেছে অনেকটা। দিনের পর দিন শোষিত-বঞ্চিত হতে হতে ও অধীন থাকার ফলে একজন নিম্নবর্গ তার প্রথম প্রতিক্রিয়া দেখানোর সাহস সঞ্চয় করেছে।

আলোচনার এই পরিসরে বলতে হয়, হরিশংকরের উপন্যাসে তথাকথিত নিম্নবর্গের প্রতিবাদের যে পরিচয় পাওয়া গিয়েছে সে তুলনায় তার গল্পবিশ্বে নিম্নবর্গের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের প্রসঙ্গ তেমনভাবে উঠে আসেনি। তবুও যে কয়েকটি গল্পে নিম্নবর্গের প্রতিবাদী চেতনাকে আমরা অনুধাবন করেছি সেখানে 'থুতু' গল্পে দেখা যায়, শামসু মুক্তিযুদ্ধে গিয়ে বন্দুকের গুলির আঘাতে পঙ্গু হয়ে বাড়ি ফিরে আসে। স্বাধীনতার প্রায় পাঁচ বছর পর রাজাকার অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতক যুদ্ধপরাধীরা সমাজে সম্মান পেতে ও ক্ষমতাবান হয়ে উঠতে শুরু করে। এর মধ্যে রাজাকার বশিরউদ্দিন একজন। কালক্রমে সে দলবল জোগাড় করে শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান থেকে চরখানপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হয়ে ওঠে। সেই থেকে শামসুল গ্রামে থাকা মুশকিল হয়ে পড়ল। কারণ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরা বশির শত্রু হিসেবে মনে করে। তাই সে শামসু জীবনকে নানাভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। বাধ্য হয়ে সর্বস্বান্ত শামসু স্ত্রীকে নিয়ে চট্টগ্রাম রেলস্টেশনে আশ্রয় নেয়। ওভারব্রিজের নিচের ছোট্ট ঝুপড়িতে রাত কাটায় তারা। কিন্তু সকাল বেলা নজমুল নামক দারোয়ান এসে শামসুকে লাঠির খোঁচা দিয়ে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে।

> 'আরে লেইঙ্গাইয়া, হারা রাইত মাইয়াপোয়া বুগত্ লই কাডাইয়ছ। ক'টিয়া দিয়ছ মাগিরে?'
>
> (জলদাস ২০১৬(ক) পৃ. ২১৫)

শামসু নজমুলের সব কথা না বুঝলেও তার রাগী চোখ মুখ ও 'মাগি' শব্দটির মানে বুঝতে অসুবিধা হয় না। নজমুলের অপমানের জবাবে শামসু মুখে কিছু না বলে-

> "শুধু ক্র্যাচটা দিয়ে নজমুলের পেটে একটা জরসে একটা গুঁতা দিল। 'ওরে মারে' বলে ধপাস করে মেঝেতে বসে পড়ল দারোয়ান নজমুল।" (জলদাস ২০১৬ (ক) পৃ.২১৫)

নাজমুলের চিৎকার শুনে আশেপাশের লোক জড়ো হলে নাজমুলের অন্যায়ের কথা সকলকে খুলে বলে শামসু। তারপর নাজমুলের দিকে তাকিয়ে সরোষে সজোরে শামসু বলে ওঠে-

> "মুক্তিযোদ্ধা আমি। একাত্তরের যুদ্ধেত গেছলাম,' 'এই ক্র্যাচ দিয়া যেমন আমি পথ চলি, পথ পরিষ্কার করি এই ক্র্যাচ দিয়া।"
>
> (জলদাস ২০১৬(ক) পৃ.২১৬)

ক্র্যাচ দিয়ে পথ পরিষ্কার করার কথা প্রসঙ্গে একজন নিম্নবর্গের প্রতিবাদী চেতনাকেই প্রকাশিত হতে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, রেলস্টেশনের বস্তিতে শামসু স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে বসবাস শুরু করলে ঘটনাচক্রে একদিন ফারহানা তারেকের দোকানে চা আনতে গেলে সেই দোকানের কর্মচারী কালাম ফারহানাকে দোকানের ভেতর ডেকে তার গালে কামড় দেয়। কাঁদতে কাঁদতে ফারহানা বাড়িতে এসে সব জানালে শামসু তৎক্ষণাৎ তারেকের দোকানে গিয়ে-

> 'শামসু কালামের মাথা বরাবর একটা জোর বাড়ি দিল ক্র্যাচ দিয়ে। 'আল্লারে' বলে মাটিতে পড়ে গেল কালাম।'
>
> (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ২১৭)

আমরা জানি শামসু একজন পঙ্গু ব্যক্তি। ক্ষমতার দিক থেকে তো বটেই, শারীরিক দিক থেকেও সে বিশেষভাবে সক্ষম। তবুও সে প্রতিটি অন্যায়-নিপীড়নের প্রতিবাদ শুধু নয়, প্রত্যাঘাতও করেছে।

মুক্তিযুদ্ধেরই প্রেক্ষাপটে রচিত 'দইজ্যা বুইজ্যা' গল্পে দেখি, ষাটোর্ধ্ব হরগোবিন্দ জলদাস সমুদ্রে দুই পুত্রকে হারিয়ে অর্ধউন্মাদে পরিণত হয়েছে। এখন তার কন্যা ছাড়া কেউ নেই। এরমধ্যে পাক সৈন্যের ক্যাপ্টেন মোর্শেদ হরগোবিন্দের প্রতিবেশী জগমোহনের কন্যা পারুলবালাকে ধর্ষণ করে যায়। এই ঘটনা অর্ধউন্মাদ হরগোবিন্দের মনে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। সে পারুলের সম্মানহানিকে তার নিজ কন্যার সম্মানহানি বলে ভাবে। প্রতিশোধস্পৃহায় জর্জরিত হরগোবিন্দ ক্যাপ্টেন মোর্শেদকে উচিত শিক্ষা দিতে চায়-

> "ঠিক তখনই উঠানে এক তীব্র হুংকার শোনা গেল, 'তোরার মারে চুদি,চোদানির পোয়াক্কল, আঁই তোরারে চাই লইয়ম।'
>
> (জলদাস ২০১৬ (ক) পৃ.২৪)

শুধু তাই নয় 'দহনকাল' উপন্যাসের মতো আলোচ্য গল্পেও পাক সৈন্যদের অত্যাচার-পীড়ন-লুণ্ঠন চোখে পড়ে। জেলে সমাজ তথা নিম্নবর্গের প্রতি পাকিস্তান শাসনযন্ত্রের এই অমানবিক আচরণকে চিরতরে বন্ধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে হরগোবিন্দ জলদাস প্রতিরোধে রাস্তায় বেছে নেয়। আলোচ্য গল্পে দেখি ক্যাপ্টেন মোর্শেদ দ্বিতীয় বার তাকে ধর্ষণ করতে এলে আগে থেকেই তৈরি হরগোবিন্দ ধারালো দা দিয়ে মোর্শেদকে কুপিয়ে হত্যা করে। গল্প অনুযায়ী,

> 'ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকে চেরাগের ক্ষীণ আলোয় মোর্শেদের গলা বরাবর কোপ মারে দইজ্যা বুইজ্যা। মাথা বাঁচাতে মোর্শেদ ডানহাত ওপরে তুললে কোপটা সেই হাতেই পড়ে। বিচ্ছিন্ন হাতটা মাটিতে পড়ে থরথর করে কাঁপতে থাকে।

> দইজ্যা বুইজ্যা থামে না। কোপাতে থাকে। একটা কোপ পাকিস্তানি হায়নাটার মাথা বরাবর পড়ে। মাথা দু'ফাঁক হবার আগে মোর্শেদ মরণ চিৎকার দেয়।' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ.২৮)

আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, হরগোবিন্দ এই প্রতিরোধ ইচ্ছাকৃত, স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রতিশোধস্পৃহা জনিত। পাক সৈন্যদের বর্বর অত্যাচার থেকে মুক্তিকামী জেলে হরগোবিন্দ উপলব্ধি করে যে মোর্শেদের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বৃহত্তর রূপান্তর ঘটানো সম্ভব। তাই সে তার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মোর্শেদকে কুপিয়ে হত্যা করে প্রতিবাদী চেতনার পরিচয় দিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বলতে হয়, অন্যায় অত্যাচার বঞ্চনা বা নিপীড়নের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের সচেতন প্রতিবাদ দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় ফল হলেও সাবঅলটার্ন স্টাডিজে বর্ণিত নিম্নবর্গের প্রতিবাদী চেতনার যে ইতিহাস লেখা হয়েছে সেখানে সাবঅলটার্ন শ্রেণি বিশেষ করে কৃষকরা ঔপনিবেশিকতা ও প্রতিরোধের কথা বাস্তবে ত্যাগ করেছিল।

> 'The 'Subaltern classes, specifically peasants' gave away in practice to the textuality of colonialism and resistance.' (Ludden (ed.) 2002, p.19)

অর্থাৎ নিম্নবর্গের প্রতিবাদী চেতনা সবসময় ইতিহাস মেনে জেগে ওঠেনি। হরিশংকরের কথাসাহিত্যে তাই নিম্নবর্গের প্রতিবাদী সত্তা অন্যায়-বঞ্চনার বিরুদ্ধেও যেমন দেখা গিয়েছে, তেমন আবার অধিকার আদায় করে নেওয়ার ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছে। নিম্নবর্গ গোটা সমাজের হয়ে কথা বলতে পারে না—গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক কথিত আলোচ্য মন্তব্যটি গল্প-উপন্যাস অনুযায়ী সঠিক হলেও নিজ সম্প্রদায় বা সমাজের জন্য নিম্নবর্গ প্রতিবাদ করেছে।

৫.২.২ সম্মিলিত প্রতিবাদ-প্রতিরোধের স্বরূপ

অন্যায়-বঞ্চনা-নিপীড়নের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের প্রতিবাদের আরেকটি স্বরূপ হল, তাদের সম্মিলিত প্রতিরোধ। আসলে যে কোনো প্রতিবাদ তার চূড়ান্ত রূপ ধারণ করে ধাপে ধাপে। নিম্নবর্গীয় প্রতিবাদী চেতনা উচ্চবর্গের বিপরীতে শ্রেণিচেতনার মধ্য দিয়ে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। লক্ষণীয় যেখানেই তথাকথিত উচ্চবর্গ তাদের আধিপত্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছে—তা সে সর্বজনসম্মতিক্রমেই হোক বা বলপ্রয়োগ করেই হোক, তার বিপরীতে তথাকথিত নিপীড়িত নিম্নবর্গ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এ সমালোচক পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন-

> 'If domination is one aspect of this relation of power, its opposed aspect must be resistance. The dialectical opposition of the two gives this relation its unity. This opposition also creates the possibility for a movement within that relation, and thus makes it possible for there to be a history of the relation of dominance and subordination,' (Chaturvedi (ed.) 2000, p.11)

অর্থাৎ আধিপত্য যদি ক্ষমতার সম্পর্কের একটি দিক হয়, তাহলে তার বিপরীতে অবশ্যই প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। উভয়ের এই দ্বান্দ্বিক বিরোধিতা ক্ষমতার সম্পর্ককে ঐক্যবদ্ধ করে এবং সেই সম্পর্কের মধ্যে একটি আন্দোলনের সম্ভাবনা তৈরি করে। এইভাবে আধিপত্য ও অধীনতার সম্পর্কের ইতিহাস তৈরি করা সম্ভব হয়।

হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যে তথাকথিত নিম্নবর্গীয় সমাজের মানুষের প্রতিরোধ গড়ে তোলার বিষয়টিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে, প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে সামাজিক কাঠামোর তথাকথিত ক্ষমতাবানদের সঙ্গে তথাকথিত নিম্নবর্গের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের ফলে নিম্নবর্গের প্রতিরোধে সত্তা বা চেতনা জাগরিত হয়েছে। অন্যায়, বঞ্চনা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে তারা তাদের সর্বস্ব বুদ্ধিমত্তা ও সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে।

'জলপুত্র' উপন্যাসে ঘটনাচক্রে জেলেরা এ সত্য অনুধাবন করে যে দাদনদার শুক্কুর ও শশিভূষণ মহাজন তাদের বহুদিন ধরে সুদ দেওয়ার নামে বঞ্চনা করে এসেছে। দেখা যায় দাদনদার শুক্কুর ঋণের অন্যায় শর্ত অনুযায়ী নিজ নির্ধারিত মূল্যে কামিনী বহদ্দারের কাছে মাছ কিনতে চাইলে সে বাধা দেয়। বাধাপ্রাপ্ত শুক্কুর কামিনীকে চড় মারে। সমুদ্রের পাড়ে কামিনীকে লাঞ্ছিত হতে দেখে অন্যান্য জেলেরা শুক্কুরের এই অন্যায়ের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানায়। রামনারায়ণ বহদ্দার শুক্কুরকে হুমকি দিয়ে বলে ওঠে,

> 'খবদ্দার আর কোনোদিন যদি কামিনী বহদ্দার অথবা অন্যকোনো জাইল্যার গাআত্ হাত তোল, তইলে হেই হাত আঁরা বেয়াগ্‌গুনে ছেঁচি দিয়ম।' (জলদাস ২০০৮, পৃ.৫৩)

জেলের গায়ে হাত তোলার প্রতিবাদ স্বরূপ জেলেরা শুক্কুর ও শশিভূষণ এর কাছে বাজার নির্ধারিত মূল্যে মাছ বিক্রির পরিকল্পনা মধ্য দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

> 'আরো অনেক সলাপরামর্শের পর ঠিক হল—যারা শুক্কুর ও শশিভূষণের কাছ থেকে দাদন নিয়েছে, তারা আগামীকাল থেকে তাদের কাছে মাছ বেচবে বাজার দরে। মহাজনদের মনগড়া দরে মাছ বেচবে না। এজন্য কোনো অঘটন ঘটলে সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে তার প্রতিরোধ করবে। কামিনী এবং অন্যান্য ঋণগ্রহীতার দাদনের টাকা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পরিশোধ করে দিতে পরামর্শ দেওয়া হল।' (জলদাস ২০০৮, পৃ.৫৪)

উপন্যাসের অন্তিম পর্বে জেলেদের যে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে শুক্কুর-শশিভূষণদের বিরুদ্ধে তা একদিনে গড়ে ওঠেনি। আসলে শুক্কুর ও শশিভূষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার পেছনে রয়েছে জেলেদের দীর্ঘদিনের বঞ্চনা, অপমান, নিপীড়ন ও গর্হিত অন্যায়-অপকর্ম। আর এর প্রাথমিক সূচনা হয়েছে শুক্কুর দ্বারা কামিনী বহদ্দারের গালে চড় মারার ঘটনা থেকে।

দ্বিতীয়ত, জেলেদের সরলতা ও নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়েছে শুক্কুর ও শশিভূষণ। জেলেদের দেওয়া ঋণের সুদের হিসেবে তারা খাতায় ভুল লিখে রাখে। নিরক্ষর জেলেরা দাদনদার হিসেব বিশ্বাস করে নেয়। কিন্তু ঘটনাচক্রে একদিন কামিনী বহদ্দারের হিসেব করতে গিয়ে শুক্কুরের ছলচাতুরি ধরা পড়ে। গঙ্গাপদ ও দয়ালহরি মাস্টারের সহায় তাঁর শুক্কুরের যোগফল ভুল লিখে রাখার ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। জেলেরা বুঝে যায় তাদের এতদিন ধরে শুক্কুর শশিভূষণরা ঠকিয়ে এসেছে। এর জবাবে তারা প্রতিরোধ গড়ে তোলে। গঙ্গাপদর নেতৃত্বে পাড়ার তরুণ জেলেরা ঠিক করে শুক্কুর ও শশিভূষণের কাছ থেকে পরের বছর থেকে দাদন নেওয়া হবে না। বহদ্দাররা সাধারণ জেলেদের টাকা দিয়ে সাহায্য করবে। শুধু তাই নয়, জেলেরা সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে জলদস্যু নৌ-ডাকাতদের হাতেও লুণ্ঠিত ও নিপীড়িত হয় মাঝেমধ্যে, জীবন বাজি রাখে ধরা মাছগুলি তারা জেলেদের কাছ থেকে নিমিষেই লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। বাধা দিতে গেলে প্রাণ হারানোর ঝুঁকি থাকে। অর্থাৎ জেলেরা জলেও বঞ্চিত-নিপীড়িত, স্থলেও বঞ্চিত-নিপীড়িত। তাই

> 'অনেক সলাপরামর্শের পর সভায় ঠিক হল শুক্কুর ও শশিভূষণ থেকে আগামী বছর দাদন নেওয়া হবে না। জলডাকাতের আঘাতের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত করা হবে।' (জলদাস ২০০৮, পৃ.৯৮)

জেলেদের পরিকল্পিত সিদ্ধান্তকে পরিণতি দেওয়ার জন্য এক গভীর রাতে গঙ্গা, জয়ন্ত, জগদীশ, অনিল প্রভৃতি তরুণেরা বিজন বহদ্দারের বাড়িতে জমায়েত হয়। সেখানে উপস্থিত থাকে রামনারায়ণ, পূর্ণচন্দ্র, গোলকবিহারী, কামিনী বহদ্দার ও কয়েকজন পাউন্যা নাইয়া। গঙ্গাপদ বহদ্দারদের উদ্দেশ্যে বলে, গত মরসুমে যাদের উপার্জন বেশি হয়েছে তারা প্রত্যেকে দুজন করে জেলেদের দাদন দেবে। বহদ্দারদের সহযোগিতায় গঙ্গাপদরা শুক্কুর-শশিভূষণের শোষণের হাত ভেঙে দিতে চায়। তাই গঙ্গা সভায় উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে বলে -

> '...চাও, আঁরা অর্থাৎ জয়ন্তদা, অনিল, আঁই, এডে যে যে যোয়ান পোয়াঅল উপস্থিত অই, হিতারার বেশির ভাগর কোনো না-জাল নাই। আঁরা শুধু তোঁয়ারার মঙ্গলল্লাই আজিয়া অঁওর অই। আঁরারে সাহায্য গর। আঁরা দাদনদারর শোষনর হাত ভাঙি দিয়ম।' (জলদাস ২০০৮, পৃ. ১০৮)

তরুণ জেলেদের প্রতিবাদ স্পৃহা দেখে বহদ্দার ও অন্যান্য জেলের সাহস সঞ্চারিত হলেও তাদের মনে দ্বিধা তৈরি হয়েছে। তাদের মতে, দাদনদারদের স্বার্থে আঘাত লাগলে তারা জেলেদের সমূহ ক্ষতি করার চেষ্টা করবে। বহদ্দার ও অন্যান্য জেলেদের মনের দ্বন্দ্ব কাটাতে গঙ্গা তাই বলে-

> '...একখান কথা মনত্ রাইখ্যো তোঁয়ারা, মাইর খাইতে খাইতে মাইনষর পিড দেয়ালত্ ঠেগি গেলে গই মাইনষে ঘুরি থিঁআ। তোঁয়ারারও ঘুরি থিআঁনর সময় হইয়ে। আঁরা আছি তোঁয়ারার লগে।' (জলদাস ২০০৮, পৃ. ১০৯)

একথা তো সত্যিই যে, দিনের পর দিন মার-বঞ্চনা-অন্যায় সহ্য করতে করতে জেলেদের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গিয়েছে। তাই তাদের ঘুরে দাঁড়ানো অর্থাৎ প্রতিরোধ করার সময় এসেছে।

তৃতীয়ত, গঙ্গাপদদের একত্রিত হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার সংবাদ অবিলম্বে শুক্কুর-শশিভূষণের কাছে পৌঁছে গেলে তারা চুপ করে বসে থাকে না। বিনা পরিশ্রমে সুদের আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে শুক্কুর প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে ওঠে।

> 'ঠান্ডা মাথার শশিভূষণ শুক্কুরকে নিয়ে বসে শেষ পর্যন্ত ঠিক করল—ডোমদের শাস্তি দিতে হবে। উচিত শাস্তি। জীবনের শাস্তি।' (জলদাস ২০০৮, পৃ.১১৭)

জেলেদের জীবন এর উচিত শাস্তি দিতে গিয়ে তারা জেলেদের ভাতে মারার পরিকল্পনা করেছে। এক অন্যায়ের পর আরো এক অন্যায়কর্মে তারা লিপ্ত হয়েছে। কয়েকদিন পর দেখা যায়, উত্তর পতেঙ্গা সমুদ্র উপকূলে চারটা তক্তার নৌকা। সেই নৌকার আরোহীরা মাছ মারার কাজে দক্ষ, যাদের শুক্কুর ও শশিভূষণ সন্দ্বীপ থেকে ভাড়া করে এনেছে। জানা যায়, মাছ মারার মরসুমে এরা দাদনদারদের হয়ে সমুদ্রে মাছ ধরবে। দাদনদারদের এই ষড়যন্ত্র জেলেদের বুঝতে অসুবিধা হয় না। শুক্কুরদের অন্যায়ের বিচার চাইতে জেলেরা ঠিক করল পরদিন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আফজালুর রহমান চৌধুরীর কাছে যাবে। কিন্তু সেখানে গিয়ে জেলেরা হতাশ হয়। কারণ তিনি তার কথাবার্তায় বুঝিয়ে দেয় শুক্কুর-শশিভূষণের অন্যায়ের প্রতিকার করতে তিনি পারবেন না। জেলেরা হতাশ হয়ে গঙ্গাপদর উঠানে জড়ো হয়। সেখানে গঙ্গা সকলের উদ্দেশ্যে বলে-

> 'যার কাছত্তোন সাহায্য পাওনর কথা, হেই চেয়ারম্যান যখন সাহায্য নো গইল্যো, তখন আঁরার অধিকার আঁরাত্তোন আদায় গরি লওন পড়িব। অন্যায়ের মূলরে হাঁড়ি দেওন পড়িবো। এই জ্যাইলাপাড়াত্ যত নৌকা আছে, কালিয়া বিয়াগ্গিন পাতাত্ যাইবো। কোনোভাবেই শুক্কুইজ্যা শইশ্যারে আঁরার সামনে জাল বোয়াইতো দিতাম নো। আঁরা পতিরোধ গইয্যম।' (জলদাস ২০০৮, পৃ. ১২৪)

চতুর্থত, জেলেদের সম্মিলিত প্রতিরোধ পরিকল্পনার কথা জানতে পেরে শুক্কুর ও শশিভূষণ গোপনে ঠিক করে-

> 'খানকির পোয়া গঙ্গাইয়ার লিডারগিরি থামাই দেওন পড়িবো।' (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৯১)

কারণ তারা জানে গঙ্গাপদ জেলেদের প্রতিনিধি। তার নেতৃত্বে জেলেরা ক্ষেপে উঠেছে প্রতিবাদের জন্য। সে ক্ষেত্রে দলের মাথাকে সরিয়ে দিলে প্রতিবাদ ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে যাবে। ফলে একরাতে গঙ্গা টাউঙ্গাজাল নিয়ে মাছ ধরতে গেলে সে আর ফিরে আসে না। পরদিন বংশীর মুখে শোনা যায়-

> 'গঙ্গা মরি গেইয়ে গই। গঙ্গারে মারি ফেলাইয়ে। আঁই শুক্কুরজ্যার খামারর ঢাগর খালত্ দেখি আস্যি।'

(জলদাস ২০০৮, পৃ.১২৭)

যে গঙ্গাপদ ছেলেবেলা থেকেই জেলেসমাজের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটি উপলব্ধি করেছে, সেই একসময় তরুণ মন নিয়ে জেলেদের মধ্যে প্রতিরোধী ভাবনাকে জাগ্রত করতে সচেষ্ট হয়েছে। গঙ্গা নেতৃত্বে জেলেদের ঘুরে দাঁড়ানোর বিষয়টি দাদনদারেরা স্পর্ধা হিসেবে দেখেছে। তাই প্রতিরোধের মাথা গঙ্গাকে চিরতরে সরিয়ে দিয়েছে তারা। এই মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য যে শুক্কুর ও শশিভূষণই দায়ী তা জেলেদের বুঝতে দেরি হয় না। গঙ্গার মৃত্যু জেলেদের মধ্যে প্রতিরোধের অগ্নিস্ফুলিঙ্গকে ত্বরান্বিত করে। ফলে

> ‘অল্পক্ষণের মধ্যে দেখা গেল শুক্কুরের খামারটি দাউদাউ করে জ্বলছে। জেলেরা দলবেঁধে সেই খামারে আগুন দিয়েছে।’
>
> (জলদাস ২০০৮, পৃ.১২৮)

আসলে জনস্বার্থের স্বতঃস্ফূর্ততা থেকে উদ্ভূত একরকম অনেক প্রতিরোধের জন্য উচ্চবর্গ তৈরি থাকে না। শশি-শুক্কুরের খামারে জেলেদের আগুন লাগানোর ঘটনা আসলে গঙ্গার মৃত্যুর প্রতিশোধস্পৃহা থেকে উদ্ভূত সম্মিলিত স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া। সাবঅলটার্ন স্টাডিজ আলোচনায় পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাই বলেন-

> ‘Subaltern studies is right that many resistances that arise out of populer spontaneity do not rely on clite initiatives, but this does not mean that they always lead to desirable consequences (popular mobilization in communal riots is an example. (Mannathukkaren, 2022, p. 142)

তাহলে ‘জলপুত্র’ উপন্যাসে জেলেদের প্রতিরোধ গড়ে তোলা ও প্রতিরোধ করা প্রসঙ্গে আমরা অনুধাবন করলাম যে আধিপত্য ও অধীনতার দুটি বিপরীত শাসন ক্ষেত্রে ক্ষমতার শৃঙ্খলাকে সম্পূর্ণতা দিয়েছে। অর্থাৎ একদিকে শুক্কুর-শশিভূষণের ছেলেদের প্রতি আধিপত্য বিস্তার করার মধ্য দিয়ে নানা অন্যায়-বঞ্চনা করা এবং অন্যদিকে সেই বঞ্চনা-অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেলেদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া ও শুক্কুরের খামারে আগুন লাগিয়ে অন্যায়ের প্রতিশোধ স্বরূপ প্রতিরোধ করা। আলোচ্য এই দ্বিমুখী সম্পর্কে নিম্নবর্গের প্রতিবাদ স্বরূপ প্রতিরোধ গড়ে তোলা নিম্নবর্গীয় চেতনার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে ধরা পড়েছে।

একইভাবে ‘দহনকাল’ উপন্যাসেও ধরা পড়েছে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাবে পাকিস্তানি সৈন্য তথা পাকিস্তানি শাসকের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে জেলে সমাজের প্রতিরোধ। ‘জলপুত্র’ উপন্যাসের মতোই আলোচ্য উপন্যাসে জেলেদের প্রতিরোধ একদিনে গড়ে ওঠেনি। এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে জেলেদের নিপীড়িত বঞ্চিত হয়ে আসার ঘটনা। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাবে রাজাকার বাহিনীর বিশ্বাসঘাতকতা ভারতের কাশ্মীর ও পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রভাবে তৎকালীন বাংলাদেশের চট্টগ্রামের জেলেজীবনকে বিপর্যস্ত করে। এর ফলে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি সাম্প্রদায়িকতায় পর্যবসিত হয়। উপন্যাসে জানা যায়, ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের আটকাতে পাকিস্তানী সৈন্যরা বাংলাদেশের গ্রাম গঞ্জের

ছড়িয়ে পড়ে। বাঙালি তরুণরা তাদের শিকারের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। তাদের হিংস্র বর্বরতায় বাংলাদেশের জনজীবন বিপর্যস্ত হতে থাকে। পাকিস্তানি সৈন্যদের একের পর এক অন্যায় অত্যাচার নিপীড়নের ঘটনা জেলেদের সহ্যের বাধ ভেঙে দেয় এক সময়। ফলে প্রতিরোধের রাস্তা বেছে নেয় জেলেরা। উপন্যাসে যে ঘটনাগুলির সম্মিলিত ফল হিসেবে জেলেদের প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে তা সংক্ষেপে দেখা যাক।

প্রথমত, পাকিস্তানি সৈন্যরা উত্তর পতেঙ্গা গ্রামকে অবরুদ্ধ করে জেলেদের জোর করে পরিখা খননের কাজে বাধ্য করে। বাঙালিদের ওপর তাদের নৃশংস, অত্যাচার, নিপীড়ন-ধর্ষণ, লুটপাঠ, নির্বিচার নারকীয় হত্যালীলা চলতে থাকে।

দ্বিতীয়ত, সমুদ্রে মাছ ধরতে গেলে সৈন্য দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় জেলেরা। রাধানাথকে ইন্ডিয়ার গুপ্তচর সন্দেহে আটকে রেখে অমানবিক অত্যাচার ও নিপীড়ন করা হয়। প্রহারের চোটে সে পঙ্গু হয়ে পড়ে।

তৃতীয়ত, পাক সৈন্য ও রাজাকাররা খন্দক খোঁড়ার জন্য মানুষ সংগ্রহ করার নামে পাড়ায় পাড়ায় নারী ধর্ষণের মতো গর্হিত অন্যায় অত্যাচার চালায়। রাধেশ্যামের বউ ও পরিমলের মেয়ে বিশাখাবালাকে ধর্ষণ করে পাক সৈন্যরা।

চতুর্থত, পাক সৈন্যরা পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিল মুক্তিযোদ্ধাদের ধ্বংস করতে। ফলে মাঝে মাঝেই তারা জেলেপাড়ায় বা মুসলমান পাড়া থেকে মুক্তিযোদ্ধা ও গুপ্তচর সন্দেহে মৃদুল, তপন, সন্তোষ ও আরো কয়েকজন তরুণদের ধরে নিয়ে যায়। তাদের মধ্যে মৃদুল নামক তরুণ জেলেকে অকথ্য অত্যাচারের পর গুলি করে হত্যা করা হয়।

পঞ্চমত, মেজর গিলানির নির্দেশে ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জনের একটি সৈন্যদল হরিদাস, নিরঞ্জন সহ আরো অনেক জেলেকে জোরপূর্বক ট্রেন্স খোঁড়ার জন্য ধরে নিয়ে যায়। কখনো সামান্য খাওয়ার দিয়ে বা কখনো অভুক্ত রেখে তাদের প্রতি অত্যাচার-নিপীড়ন করা হয়েছে। শেষে নিকুঞ্জকে জোর করে মুখে গোরুর মাংস ঢুকিয়ে দিয়ে হিন্দু ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করেছে পাক সৈন্যরা।

ষষ্ঠত, মুসলিম পাড়া ও জেলেপাড়ায় রাজাকার ও পাকসৈন্যরা জোর করে তাদের গোরু ছাগল মুরগি লুণ্ঠন করে। বাধা দিতে গেলে বন্দুকের বেয়নট দিয়ে আঘাত করে সৈন্যরা।

মুক্তিযুদ্ধের প্রভাবে পাকসৈন্য দ্বারা অন্যায় নিপীড়ন দীর্ঘদিন ধরে সহ্য করে আসা জেলেরা যখন দেখল তাদের মা-বোনদের সম্মানে আঘাত করেছে তখন তারা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আমরা জানলাম জেলেদের উত্তেজিত মানসিকতার ভাষ্য -

> ‘আমাদের মধ্যে একটা প্রস্তুতি চলছে—প্রতিশোধ নেওয়ার প্রস্তুতি, প্রত্যাঘাত করার প্রস্তুতি। আবার যদি আমাদের কোনো মাকে, বোনকে, অবুঝ কন্যাকে অপমান করতে আসে, তাহলে তাদের আর আস্ত ফিরে যেতে হবে না। আমাদের জান যাবে, কিন্তু আর মান যেতে দেব না। আমাদের ভেতরে অপমানের যে আগুন জ্বলছে, সে আগুন বড়ো বড়ো গলার আগুনের চেয়ে দাহ্যগুণ সম্পন্ন। অপমানের সেই আগুনে পুড়িয়ে মারব আমরা শত্রুদের, প্রাণ দিয়ে তাদেরকে আমরা এই পাড়া থেকে আর ফিরে যেতে দেব না।’ (জলদাস ২০১০, পৃ.১৮০)

জেলেদের এই প্রতিরোধের সংকল্প অনুযায়ী উপন্যাসে দেখা যায়, রাধেশ্যামের বাড়ির পেছনে নানাজনের বাড়ির বাঁশঝাড় থেকে নলিবাঁশ, বোরাও বাঁশ কেটে এনে জড়ো করা হয়। শুধু তাই নয়, পাক সৈন্যদের আক্রমণ করার অস্ত্রশস্ত্র তৈরির পাশাপাশি তারা গভীর রাতে জেলেপাড়া ঢোকার রাস্তার নিচে সুরঙ্গ খোঁড়ে। হরিদাসের অনুমান অনুযায়ী পাকসৈন্যরা হামিদের দেখানো পথে পরিমলের উঠানে উপস্থিত হয় সেই রাতে। সৈন্য প্রধান আনসারি পরিমলের ঘরের ভেতরে ঢোকার কিছুক্ষণের মধ্যেই খু-উ বুইজ্যা আনসারিকে ছুঁচালো বাঁশ দিয়ে আঘাত করলে আনসারি তাকে গুলি করে ধরাশায়ী করে।

> ‘এইসময় পরিমলের রান্নাঘরের পাশ থেকে দ্রুতবেগে বেরিয়ে এলো রাধেশ্যাম, হাতে দিনের পর দিন ঘষে ঘষে ধারালো করে তোলা লম্বা দা-টি। উঠানে পাহারারত সৈন্যরা বুঝে ওঠার আগেই আনসারির গলা লক্ষ করে সে দা-টি চালিয়ে দিল। গোঁৎ একটা শব্দ করে আনসারির বিপুল দেহটি উঠানে লুটিয়ে পড়ল। একজন পাকসেনার রাইফেলের গুলি রাধাশ্যামের মাথার খুলি উড়িয়ে দিল। ঠিক এই সময়ে পরিমলের বাড়ির চারদিক থেকে অজস্র ইটের টুকরা ও সুঁচালো বাঁশ তীরের গতি নিয়ে পাকসেনা ও রাজাকারদের গায়ে মাথায় এসে আঘাত করতে লাগল।’
>
> (জলদাস ২০১০, পৃ. ১৯৩)

দেখা গেল, জেলেদের প্রতিরোধের সীমানা বা সংহতির কোনো একক নির্দিষ্ট চরিত্র নেই যা সরাসরি তার তাৎক্ষণিক আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট বা সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে অনুমান করা যায়। বিস্তৃত অর্থে, পরাধীনতা ও প্রতিরোধ উভয় ক্ষেত্রেই নিম্নবর্গীয় চেতনা উপলব্ধি করে যে প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে তারা একটি বৃহত্তর পরিসরে কাজ করতে এবং রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম। এই ক্ষমতা বা প্রতিরোধ বিদ্রোহ বা আন্দোলনকে একটি ইচ্ছাকৃত এবং সক্রিয় বিদ্রোহী চেতনা উদ্দেশ্য পূরণে সচেষ্ট হয়। ঔপনিবেশিক ভারতে ঘটে যাওয়া কৃষক বিদ্রোহের বিশ্লেষণে সমালোচক পার্থ চট্টোপাধ্যায় কৃষক চৈতন্যের প্রতিরোধ সংগঠন ও রূপদান সম্পর্কে একথাই বলেছেন যা শুধু কৃষকদের ক্ষেত্রেই নয়, তথাকথিত নিম্নবর্গের প্রতিবাদী চেতনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাঁর মতে,

> ‘The boundaries or forms of solidarity in peasant rebellions have no single detreminate character that can be directly deduced either from its immediate socio-economic context or from its cultural world. … in the broadest sense available to a peasant conciousness, for from being narrow and inflexible, is

> capable of a vast range of transformations to enable it to understand, and to act within, varying context, both of subordination and of resistance.' (Chaturvedi (ed.) 2000, p. 14)

'দহনকাল' উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে জেলেদের সংহতি ও প্রতিরোধেরও কোনো নির্দিষ্ট চরিত্র নেই। পরাধীনতা অর্থাৎ অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মাধ্যমে জেলেরা পাক সৈন্যদের অত্যাচারের প্রতিশোধ এবং একই সঙ্গে তাদের বিতাড়িত করতে চেয়েছিল যার ফলে সম্মিলিত প্রতিবাদ গড়ে উঠেছে।

'রামগোলাম' উপন্যাসে দেখি, ফিরিঙ্গিবাজার সেবক কলোনিতে মেথর সন্তানদের পড়াশোনার জন্য পাকিস্তান সরকার একটি স্কুল তৈরি করলে সেখানে পরবর্তীকালে মেথর সন্তানদেরই প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। সমাজের তথাকথিত ভদ্রলোকের দায়িত্ব নিয়ে তাদের ছেলে মেয়েকে স্কুলে পড়ানোর সুযোগ করে দেয়। বঞ্চিত করে মেথর সন্তানদের। এই ঘটনায় মেথররা ক্ষুব্ধ ও অপমানিত বোধ করলে মেথর সর্দার গুরুচরণ এর প্রতিবাদ স্বরূপ মেথরদের একত্রিত করে,

> 'সবাই মিলে করপোরেশনে নালিশ জানাল, শিক্ষা অফিস নালিশ জানাল। বাবা সর্দার বলে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করলো বেশি। এক রাতে বাপকে মেরে রাস্তায় শুইয়ে দিয়ে গেল ওরা।' (জলদাস ২০১২, পৃ.২৮)

শুধু তাই নয়, গুরুচরণ মেথরদের নিয়ে শিক্ষা অফিসে প্রতিবাদ করতে গেলে অফিসার তাদের অকথ্য ভাষায় গালাগাল করে তাড়িয়ে দেয়। তাতেও গুরুচরণ না দমলে তাকে পিয়ন-আরদালি দিয়ে প্রহার ও অপমান করা হয়। সুতরাং অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিম্নবর্গের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার ফল ফলপ্রসূ হয়নি কোনোবার। উচ্চবর্গের প্রতিরোধের সামনে তাদের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ার কাজ হয়নি। আসলে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক তাঁর 'Can the Subaltern Speak?' প্রবন্ধে জানিয়েছেন- নিম্নবর্গ তার কথা অন্যকে বোঝাতে অক্ষম। কারণ উচ্চবর্গীয় চেতনায় নিম্নবর্গ বরাবর অলীক। তাকে গুরুত্ব দিয়ে শোনা বা বোঝার মতো কোনো রিসিভার উচ্চবর্গের মধ্যে নেই। (Landry (eds.) 1996, p.272)

যদিও 'রামগোলাম' উপন্যাসে মেথরসমাজের মূল সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে তাদের জন্য নির্ধারিত চাকরি সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার মধ্য দিয়ে। আসলে জীবিকা যেখানে মূল প্রশ্ন চিহ্ন হয়ে দাঁড়ায়, সেখানে জীবন অনিশ্চয়। সেই কারণে কর্পোরেশনের বড়োবাবু আবদুস ছালামের সঙ্গে মেথরদের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। আর যেখানে দ্বন্দ্ব হয়, সেখানে দুই তরফেই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রাথমিক প্রতিবাদের সূচনা হয়। তাইতো আবদুস ছালামের অন্যায় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কার্তিক বলে ওঠে,

> 'নোংরা কাজ করতে করতে আমাদের জীবন ক্ষয়ে ফেলেছি। পুরুষানুক্রমে আপনারা মানে ভদ্রলোকেরা আমাদের ব্যবহার করেছেন। আজ সরকারের দোহাই দিয়ে আমাদের পেটে লাথি মারতে চাইছেন।' (জলদাস ২০১২, পৃ. ১৭৯)

এরপর মেথরদের তরফ থেকে মনুলাল, চেদিলাল, মদোশ্যামল ও রামগোলামের মৌখিক প্রতিক্রিয়া একে একে লক্ষ করা গিয়েছে। দেখা যায় মনুলাল প্রথমে বড়ো সাহেবের হয়ে কথা বললেও স্বজাতির স্বার্থে আঘাতের ফলে সেও মেথরদের হয়ে প্রতিবাদে সামিল হয়েছে। এক্ষেত্রে মনুলালের প্রতিক্রিয়া -

> 'আর বেইমানি নয়। জাতের সঙ্গে আর বেইমানি করব না। আপনি আপনার নোটিশ ফিরিয়ে নিন, নইলে ভালো হবে না।' (জলদাস ২০১২, পৃ.১৮০)

চেদিলালের প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা যায়-

> 'আমরা স্ট্রাইক করব। আবর্জনা পরিস্কার করব না। দিনের পর দিন।' (জলদাস ২০১২, পৃ.১৮০)

মদোশ্যামল চেদিলালের কথার রেশ ধরে বলে ওঠে

> 'তখন বুঝবেন মজা। ভদ্রলোকদের বারোটা বাজবে তখন।' (জলদাস ২০১২, পৃ. ১৮০)

সর্দার রামগোলামেরও একই প্রতিক্রিয়া প্রতিধ্বনিত হয়েছে-

> 'আমরা অচল করে দেব সব। আবর্জনায় সয়লাব হয়ে যাবে গোটা শহর। ময়লার ডিপো হবে।'
> (জলদাস ২০১২, পৃ. ১৮০)

মেথরদের প্রতিক্রিয়া ও আন্দোলন করার হুমকি শুনে বড়ো সাহেব আবদুস ছালাম উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তার বক্তব্য—তাকে ভয় দেখিয়ে লাভ হবে না তাদের। তিনি মেথরদের ক্ষমতার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলেন। কিন্তু রামগোলাম প্রতিবাদী ও অধিকারবোধে সচেতন। তাই সে বলে -

> 'ভয় না স্যার, হকের কথা বলছি। সুইপারের চাকরিতে আমাদের পুরুষানুক্রমে হক আছে।' (জলদাস ২০১২, পৃ. ১৮১)

অধিকারবোধে সচেতন হওয়া মেথরদের মধ্যে ধর্মঘট করার পরিকল্পনার প্রতিক্রিয়া নিম্নবর্গীয় চেতনার প্রতিবাদী সত্তাকে পরিস্ফুট করেছে। শুধু তাই নয়, যে হারাধনবাবু সর্বদা বড়োবাবুর অনুগত হয়ে কাজ করে আসছিল সেও একসময় মেথরদের অধিকারের পক্ষে প্রশ্ন করেছে। কারণ হারাধনবাবু দেরিতে হলেও বুঝতে পেরেছেন যে তিনি মেথরদেরই একজন। তাইতো সে আবদুস ছালামকে তার অন্যায় কর্মকাণ্ডের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন একে একে।

> 'ভয় না স্যার, সাবধান করছি। আপনি মেথরপট্টির সঙ্গে লাগিয়ে কসাইখানা তৈরি করলেন। মিথ্যাকে সত্যের আবরণে বোঝালেন তাদের। ধর্মের আফিম খাওয়ালেন। শেষ পর্যন্ত কী করলেন আপনি? ধর্মনাশ করলেন তাদের। এতে শুধু মেথররা রেগে গেল না, গোটা চট্টগ্রামের হিন্দুরা, এমনকি আপনার করপোরেশনের লোকেরা পর্যন্ত আপনাকে ঘৃণা করতে শুরু করল।' (জলদাস ২০১২, পৃ. ১৮৭)

সকলের প্রতিবাদের মুখে পড়ে আবদুস ছালাম আরো প্রখর হয়ে উঠেছেন। ক্ষমতার দম্ভ ও ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তিনি নিজ সিদ্ধান্তে অটল থেকেছেন। কারণ তিনি জানেন কর্পোরেশনের সিদ্ধান্তকে স্তিমিত বা পরিবর্তন করার সাধ্য মেথরসমাজের নেই। নিম্নবর্গকে তুচ্ছ ভাবার মানসিকতা আসলে উচ্চবর্গীয়

চেতনারই বৈশিষ্ট্য। এ প্রসঙ্গে বলতে হয় 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এ চর্চিত কৃষকদের প্রতিবাদী চেতনা স্বরূপ বলা হয়েছিল-

> “The insurgent consciousness was, first of all, a ‘negative consciousness’, in the sense that its identify was expressed solely thought an opposition, namely, its difference from and antagonism to its dominators.” (Chaturvedi (ed.) 2000, p.12)

অর্থাৎ নিম্নবর্গের প্রতিবাদী চেতনা আসলে তাদের একটি নেতিবাচক চেতনা। কারণ প্রভাবশালীর বিপরীতে নিম্নবর্গ তাদের সর্বোচ্চ শক্তি প্রকাশের কথা বলে প্রভাবশালীর ক্ষমতা না জেনেই। ফলে প্রথম থেকেই উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গের মধ্যে ক্ষমতা প্রদর্শনের বিরাট পার্থক্য তৈরি হয়ে থাকে। সেই কারণেই আকর্ষণের ক্ষমতা না জেনেই নিম্নবর্গীয় মেথররা তাদের ধর্মঘট পরিকল্পনা ও তারা কি কি করতে পারে তা আগে থেকে জানিয়ে দেয় বড়োবাবুকে। আর বড়োবাবু তাদের পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করার জন্য কীভাবে নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করবেন, তা পরিকল্পনা করার সময় ও সুযোগ পেয়ে যান। উপন্যাসে,

> ‘করপোরেশনের বিল্ডিংয়ের সামনের মাঠে হরিজনরা অবস্থান নিয়েছে। মাঠ ছাড়িয়ে রাজপথ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে তারা। চার পট্টির হাজার পাঁচেক হরিজন আজ নিত্যদিনের সব কাজকাম ফেলে ঘেরাও-এ অংশ নিয়েছে। সবার সামনে রামগোলাম। তারপাশে কার্তিক, চেদিলাল, রামপ্রসাদ, চমনলাল, ইন্দল, বাল্লু, শক্তিলাল, মনুলাল—এরা। এদের পাশে পাশে হরিজনপল্লির আবালবৃদ্ধবনিতা।’ (জলদাস ২০১২, পৃ. ১৮৯)

দেখা গেল, চতুর্থদিনে হরিজনদের ধর্মঘট করতে উস্কে দেওয়ার অভিযোগে বড়োবাবু আবদুস ছালাম রামগোলামকে বরখাস্ত করলেন। ফলে উত্তেজনা আরো ছড়িয়ে পড়ে মেথরপল্লিতে। অন্যদিকে গত তিনদিনে মেথরদের ধর্মঘটের জন্য গোটা চট্টগ্রাম শহর ময়লা-আবর্জনায় সয়লাব। নালা-নর্দমা নোংরা জলে উপচে পড়ে রাজপথ ভরিয়ে ফেলেছে। আবর্জনার দুর্গন্ধে শহরবাসীর দূরবস্থা। শত শত টেলিফোন আসতে থাকে কর্পোরেশন অফিসে। সেখান থেকে শহরবাসীকে সঠিক তথ্য দেওয়ার বদলে দুদিন পর সব পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়। এরকম অবস্থায় রামগোলাম ঘোষণা করে,

> ‘... আগামীকাল সকাল থেকে করপোরেশনের বাইরে ভেতরে অবস্থান নেব আমরা। হাতে বেলচা-কাঁটা, নারী পুরুষ সবাই আসবে। কালকে আমাদের জীবন মরণের দিন। কালকে চৌদ্দ তারিখ। (জলদাস ২০১২, পৃ. ১৮৮)

উপন্যাস অনুযায়ী পরদিন কর্পোরেশনের সামনে অবস্থান কালে মেথরদের সঙ্গে চাকরিপ্রার্থীদের বিরোধিতা তৈরি হয়েছে। হঠাৎই চাকরিপ্রার্থীদের ভিড়ে বেইমান-বিশ্বাসঘাতক যোগেশকে দেখতে পায় মেথররা। হরিজনদের মধ্যে থেকে যোগেশকে মারার জন্য আওয়াজ উঠলে অপর প্রান্তে থাকা চাকরিপ্রার্থীরা কিছু না বুঝে তারাও মেথর দিকে ধেয়ে আসে।

> ‘চিৎকার-চেঁচামেচি বিরাট হট্টগোলে পরিণত হল। তুমুল গালাগালি। প্রচন্ড আস্ফালন। মুষ্টিবদ্ধ হাতের ওপরে- নিচে ওঠা নামা। রক্তচক্ষু। টান টান পেশি। বিপরীত পক্ষের দিকে ধেয়ে আসা।’
>
> ... বেলচা, কাঁটা, ঝাড়ু হাতে চাকরিপ্রার্থীদের দিকে হরিজনদের ধেয়ে যাওয়া। গালাগালি থেকে মারপিট। চারিদিকে হইচই, ধুমধাম আওয়াজ, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। (জলদাস ২০১২, পৃ. ১৮৯-৯০)

সমাজ কাঠামোর বিন্যাসে ক্ষমতা যেখানে মূল কথা সেখানেই উচ্চবর্গ-নিম্নবর্গের বিপরীত সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছে। সমালোচক দীপেশ চক্রবর্তী তাঁর ‘A small history of subaltern studies’ প্রবন্ধে বলেছেন নিম্নবর্গের রাজনীতির বৈপরীত্য ও শ্রেণিচেতনা আসলে উচ্চবর্গের আধিপত্যের প্রতি একটি প্রতিরোধের ধারণা। তাঁর বক্তব্য

> ‘In the domain of “Subaltern politics,” on the other hand, mobilization such as “the traditional organization of kinship and territoriality or a class consciousness depending on the level of the consciousness of the people involved.” They tended to be more violent than clite polities. Central to subaltern mobilizations was “a notion of resistance to elite domination.”
>
> (Schwarz (eds.) 2005, p. 472)

অর্থাৎ নিম্নবর্গের রাজনীতি ও তাদের প্রতিরোধের চেতনা সংহতির অনুভূমিক সংযুক্তি ও শ্রেণিচেতনার উপর নির্ভর করে। এর মধ্যে দিয়ে অভিজাত রাজনীতির চেয়ে নিম্নবর্গের আরো বেশি হিংস্র হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। কারণ নিম্নবর্গের সম্মিলিত হওয়ার কেন্দ্রবিন্দু ছিল অভিজাত আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ধারণা।

সুতরাং হরিশংকরের গল্প-উপন্যাসে বর্ণিত তথাকথিত নিম্নবর্গের প্রতিরোধ গড়ে তোলার বিষয়টিও যে ‘a notion of resistance to elite domination’ তা আমরা দেখলাম, বিশেষ করে ‘জলপুত্র’ উপন্যাসে শুক্কুর ও শশিভূষণের খামারে আগুন লাগিয়ে দেওয়া বা ‘দহনকাল’ উপন্যাসে পাক সৈন্যদের বিরুদ্ধে একত্রিত প্রতিরোধ ও রাধেশ্যাম দ্বারা ক্যাপ্টেন আনসারির হত্যা অথবা ‘দইজ্যা বুইজ্যা’ গল্পে হরগোবিন্দ দ্বারা ক্যাপ্টেন মোর্শেদের হত্যা ও ‘অর্ক’ উপন্যাসে রহমালি কর্তৃক ছোবান মেম্বারের হত্যার ঘটনার মধ্য দিয়ে, যা আসলে দীর্ঘদিন ধরে নিম্নবর্গকে পিষ্ট করার এক আকস্মিক পরিণাম।

৫.৩ কথাবিশ্বে নিম্নবর্গীয় নারীর প্রতিবাদ

হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যে বর্ণিত নিম্নবর্গীয় সমাজে অন্যায়-শোষণ-নিপীড়ন ও বঞ্চনা যেমন নারী-পুরুষ নির্বিশেষের প্রতি ঘটেছে, তেমনই উভয়ের তরফ থেকেই প্রতিবাদ-প্রতিরোধও উঠে এসেছে। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের নিম্নবর্গীয় নারী পুরুষতান্ত্রিক সমাজের চার দেওয়ালের ভেতর নিজেকে অবরুদ্ধ করে রাখার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে সর্বদা। তাই সেই দেওয়াল ভাঙার কথা তাদের কল্পনাতেও আসেনি

কখনো। যদিও কথাসাহিত্যে নারীর অবস্থান গুরুত্বপূর্ণভাবে উঠে আসতে না দেখলেও কাহিনির ঘটনাচক্রে নিম্নবর্গীয় সমাজের নারীরা প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী অন্যায়-বঞ্চনা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধে মুখর হয়ে উঠেছে। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ঔপনিবেশিক কালখণ্ডে নারীদের অবগুণ্ঠন খুলতে শুরু করেছে।এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, তথাকথিত নিম্নবর্গীয় নারীর প্রতিবাদগুলির বিভিন্ন ধরন। কথাবিশ্বে নারী কখনো প্রতিক্রিয়াশীল, কখনো প্রত্যাঘাতী, কখনো আত্মঘাতী ও কখনো নীরব। আলোচনার এই পরিসরে নারী প্রতিবাদের আলোচ্য ধরনগুলি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে কথাবিশ্বে নিম্নবর্গীয় নারীর প্রতিবাদী চরিত্রটি অনুধাবন করার চেষ্টা করব।

৫.৩.১ নারীর সরব ও ঘাতক প্রতিবাদ :

হরিশংকর জলদাসের কথাসাহিত্যে তথাকথিত নিম্নবর্গীয় নারীচরিত্রের বহুল সমাবেশ ঘটলেও তাদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধী চেতনা স্বল্প স্থান জুড়েই উঠে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ আমরা স্মরণ করে নিতে পারি সেই সব নারী চরিত্রদের যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। লক্ষণীয়, 'দহনকাল' উপন্যাসে বিধবা চন্দ্রকলা দাসী হরিদাসের সহপাঠী সুধীরের হাতে নাতিকে লাঞ্ছিত-প্রহৃত হতে দেখে নিজেকে ধরে রাখতে পারেনি। সুধীরের বাড়িতে গিয়ে তার পিতা মনোরঞ্জনের কাছে পুত্রের সকল অপকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে সোচ্চারে। উপন্যাস অনুযায়ী-

> 'সেই ভরদুপুরে অক্ষত জেলেপল্লির চন্দ্রকলা নামের বিধবাটি মনোরঞ্জন বহদ্দারের উঠানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠেছিল; 'বহদ্দার, অ মনোরঞ্জন বহদ্দার, বাইর হ। চা তোর পোয়ার কীর্তি।'
>
> এপাড়ার কেউ কোনোদিন চন্দ্রকলাকে এরকম উগ্রমূর্তিতে দেখেনি, এরকম চিৎকার করে কথা বলতেও শোনেনি কেউ। আজ তার কী হলো!' (জলদাস ২০১০, পৃ.৮৭)

আজ চন্দ্রকলার সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গিয়েছে। দিনের পর দিন অপমানিত-নিপীড়িত-বঞ্চিত চন্দ্রকলা জীবন সংগ্রাম করতে করতে এ সত্য অনুধাবন করেছে, যে ভীতি ও হারানোর শঙ্কা নিয়ে সে বা তারা চুপ করে সব সহ্য করে আসছিল আজ তার বা তাদের ঘুরে দাঁড়ানোর সময় এসেছে। নাতিকে লাঞ্ছনা বা প্রহার করা তো কেবল আজীবন সঞ্চিত ক্ষোভ উগরে দেওয়ার সামান্য উপকরণ মাত্র। আজ তাই মনোরঞ্জন বহদ্দারের কাছে যৌক্তিক প্রশ্ন করে চন্দ্রকলা,

> 'চাও, চাও তোঁয়ার পোয়া আঁর নাতিরে কী-য্যে। আঁর নাতি পাস গইয্যে হিয়ান হিতার অপরাধ।'
>
> (জলদাস ২০১০, পৃ. ৮৭)

একজন জেলেসন্তানের শিক্ষিত হয়ে ওঠার পেছনে যে সমাজের অন্যান্য তথাকথিত ক্ষমতাবান মানুষের ঈর্ষা বা অশুভাকাঙ্ক্ষা রয়েছে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না চন্দ্রকলার সঙ্গে আমাদেরও। তাই নাতির লাঞ্ছনায় নিজের লাঞ্ছনা অনুভব করে চন্দ্রকলা। আজীবন মার খেয়ে মার সহ্য করা চন্দ্রকলার মতো ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নারী নিজের স্বাভিমান রক্ষার্থে গর্জে উঠেছে।

লক্ষণীয় চন্দ্রকলা নিজের অপমান বা বঞ্চনার জন্য প্রতিবাদ করেনি। নাতির অপমান-বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে সে। এর প্রেক্ষিতে আমরা বলতেই পারি নিম্নবর্গের নিজস্ব স্বতন্ত্র চেতনা রয়েছে বলেই অবস্থাভেদে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে তারা। এই কারণেই 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ'-এর ঐতিহাসিক-সমালোচকরা উচ্চবর্গের রাজনৈতিক চেতনার বিপরীতে নিম্নবর্গীয় চেতনার স্বতন্ত্র বিবেচনায় জোর দিয়েছেন।

একইভাবে 'কসবি' উপন্যাসে বর্ণিত পতিতাসমাজেও পতিতাপল্লির নারীদের প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠতে দেখা গিয়েছে। উপন্যাসে সাহেবপাড়া পতিতাপল্লিতে কালু সর্দারের আধিপত্যে পতিতারা বঞ্চিত নিপীড়িত হয়ে আসছে দিনের পর দিন। কিন্তু সময় বদলায়। মোহিনী মাসির ছেলে কৈলাস এসে পতিতাদের অধিকার বোধে জাগরিত করে। ইলোরা ও বনানী নামক পতিতারা সেইমতো সপ্তাহে একদিন ব্যবসা বন্ধ রাখার পরিকল্পনা করলে কালু সর্দার বনানীকে গালমন্দ করে তার গালে চড় মারে। ইলোরা এই ঘটনার প্রতিবাদে বলে ওঠে,

> 'গালি দিয়েন না সর্দার। আমাগো শরীরও শরীর। আপনাগো শরীর যদি বিশ্রাম চায়; আমাগোর শরীর চায় না?'
>
> (জলদাস ২০১১, পৃ.১৫২)

ইলোরার প্রতিক্রিয়ায় বনানীও চুপ থাকেনা। সেও তার সিদ্ধান্তে অটল থাকার কথা সর্দারকে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়,

> 'তুমি সর্দার, মারতে পার। তোমার গুন্ডা-মাস্তান আছে। কিন্তু আমাগোর এককথা- শুক্রবার আমরা কাস্টমার ঢুকামু না ঘরে।' (জলদাস ২০১১, পৃ. ১৫৩)

বনানীর বক্তব্যে স্পষ্ট যে, ক্ষমতার দম্ভে ও আস্ফালনে কালু পতিতাপল্লিতে তার আধিপত্য বিস্তার করেছে। কিন্তু একজন তথাকথিত নিম্নবর্গের হয়ে বনানী যে সাহস ও স্বাভিমানের উপর নির্ভর করে নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকার কথা ক্ষমতাবান সর্দারকে জানিয়েছে তা আসলে দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচারিত শোষিত মানসিকতার সোচ্চার প্রতিবাদ।

অন্যদিকে 'রামগোলাম' উপন্যাসে রূপালী নামক চরিত্রটি প্রতিবাদী চেতনায় অনন্য। আলোচ্য উপন্যাসের বর্ণনা অনুযায়ী-

> 'কিন্তু রূপালীর স্বভাব অন্যরকম। সে প্রতিবাদী। তার বাবা হাজার চেষ্টা করেও তাকে বোঝাতে পারিনি যে মেথরদের প্রতিবাদ করতে নেই। ... বাবা রূপলাল যতই বোঝাক, কাজ কিছুই হয়নি। কোথাও অবহেলা অসঙ্গতি দেখলেই ফুঁসে ওঠে রূপালী।' (জলদাস ২০১২, পৃ. ৭৭-৭৮)

রূপালীর ফুঁসে ওঠার ঘটনা লক্ষ করা যায় রশিদের খাবারের দোকানে। উপন্যাসের ঘটনাক্রমে একদিন রূপালী হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত হয়ে রশিদের দোকানে খাবার কিনতে যায়। সেখানে তার আলুথালু সাজপোশাক দেখে রশিদের চোখ কামজর্জরিত হয়ে ওঠে। ফলে সে অকারণ রূপালীকে 'সোনা' সম্মোধন করে। দোকানের কর্মচারী জামাল অশ্লীলভাবে তার চোখ টেপে, সোহেল দালাল জিহ্বা বের করে বিকৃত ভঙ্গি করে। রূপালী তাদের মতলব বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ গর্জে ওঠে-

> 'হারামির পুত, সোনা ডাকস কারে? গর্জে ওঠে রূপালী। তার ডান হাতের তর্জনী চ্যাংড়াদের দিকে প্রসারিত।'
>
> (জলদাস ২০১২, পৃ. ১২১)

কিন্তু রশিদ আরো তাকে উত্যক্ত করে। রূপালী নিজেকে আর ধরে রাখতে না পেরে হুংকার দিয়ে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে।

> 'শুয়রকা লেড়কা, মা-চোদ। হামে গালি দে রাহা হে তু?' বলতে বলতে পাশের চেয়ারটি উল্টে মেঝেতে ফেলে দিল রূপালী।' (জলদাস ২০১২, পৃ. ১২২)

ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি নিম্নবর্গের প্রতিবাদী চেতনা তখনই জাগরিত হয় যখন আধিপত্যবাদী শ্রেণি তাদের অস্তিত্বে আঘাত করে বা বলা ভালো তাদের মানুষ রূপে গণ্য করে না। রূপালীর ক্ষেত্রেও তার আত্মসম্মানের প্রশ্ন এসেছে। কিন্তু নিম্নবর্গের 'limited strenth'-এর কারণে রূপালীর প্রতিবাদের তীব্রতাও সীমিত। তাই সে রশিদ ও জামালদের গালাগাল করে এবং সজোরে চেয়ার উল্টে ফেলার মধ্য দিয়ে তার সমস্ত ক্ষোভ উগরে দেয়।

আবার 'কুন্তীর বস্ত্রহরণ' উপন্যাসে কুমোরপাড়ার শ্মশানকে দখল করে সেখানে একটি বাগান বাড়ি নির্মাণের পরিকল্পনা করে চেঙ্গুটিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আবুল কাশেম। তাই সে কুমোরপাড়ায় উপস্থিত হয়ে তার ইচ্ছের কথা প্রকাশ করে। এই শ্মশানের বদলে সে অন্য এক জায়গায় প্রাচীর ঘেরা শ্মশান করে দেওয়ার প্রস্তাব দেয় কুমোরদের। চেয়ারম্যানের এই কথা শুনে,

> 'হঠাৎ ভিড় ঠেলে কুন্তীসামনে এগিয়ে আসে। সামান্য ঘোমটা টেনে বলে, 'এ কী কইতাছেন চেয়ারম্যান সাব! পূর্বপুরুষের শ্মশান আমাগোর! আমাগোর বাপ-দাদা, তাগোর মা-বাপ, কত শত আত্মীয়স্বজনের স্মৃতি জড়াইয়া আছে ওই শ্মশানের লগে! আপনি কী কইরে বলেন অই শ্মশান ছেইড়ে দিতে! (জলদাস ২০২১ পৃ. ৯৮)

আমরা আগেই জেনেছি প্রতিবাদই হলো এমন মুহূর্ত যখন উচ্চবর্গ নিম্নবর্গকে চেতনা সম্পন্ন মানুষ হিসেবে মনে করে। তাইতো চেয়ারম্যানের প্রস্তাবে কুন্তীর আপত্তি ও প্রতিক্রিয়ায় আবুল কাশেম স্তম্ভিত হয়। কারণ,

> ‘কেউ, বিশেষ করে কোনো নারী তার কথার প্রতিবাদ করবে, মোটেই আশা করেনি আবুল কাশেম। চোখের কোনা জ্বলে উঠে কাশেমের।’ (জলদাস ২০২১ পৃ. ৯৮)

আবুল কাশেমের মতো সমাজে সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা তথাকথিত ক্ষমতাবান উচ্চবর্গ নিম্নবর্গের এ ধরনের প্রতিবাদ বা প্রতিক্রিয়ায় প্রাথমিক বিস্মিত হয়েছে। কেননা উচ্চবর্গীয় চেতনা ক্ষমতার এক প্রান্তে অবস্থিত আধিপত্যকে ধারণ করে। নিম্নবর্গের মানুষেরা তাদের কাছে অলীক কল্পিত বলে তাদের যে নিজস্ব মতবাদ ও চেতনা থাকতে পারে তা তথাকথিত উচ্চবর্গ ভাবতেই পারে না। আবুল কাশেমও কুন্তীর প্রতিবাদ আশা করেনি। উল্টোদিকে ক্ষমতার আরেক প্রান্তে অবস্থিত নিম্নবর্গীয়তা প্রতিবাদ-প্রতিরোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ। তাই আবুল আরো একবার কুমোরদের অন্য শ্মশান করে দেওয়ার লোভ দেখালে কুন্তী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে,

> ‘দরকার নাই আমাগোর বাঁধানো শ্মশানের। পূর্বপুরুষের এই শ্মশানডা আমাগোর মাথার ওপর থাউক। আমাগো শ্মশানের দিকে কুনজর দিবেন না চেয়ারম্যান সাব।’ (জলদাস ২০২১ পৃ. ৯৯)

কুন্তীর হুমকিতে আবুল কাশেম বিস্ময়ে হতবাক। কুমোর পুরুষদের মাঝখানে কুন্তী মেয়ে মানুষ হয়ে কেন কথা বলছে—আবুলের এই প্রশ্নে ও ধমকে কুমোররা একত্রিত হয়ে আওয়াজ তোলে,

> ‘ওকে ধমকাইয়েন না চেয়ারম্যান সাব।’ (জলদাস ২০২১ পৃ. ১০৩)

কুন্তীর প্রতিনিধিত্বে কুমোর-মালোদের একত্রিত হতে দেখে নিরুপায় আবুল কাশেমের কাছে প্ররোচনা করা ছাড়া আর কোনো পথ থাকে না। আমরা আগেই জেনেছি রণজিৎ গুহ কথিত ক্ষমতার শৃঙ্খলায় আধিপত্যের মূল বৈশিষ্ট্য হল, প্ররোচনার মধ্য দিয়ে আধিপত্য সৃষ্টি করা। তাই আবুলও বেআইনিভাবে মালোদের বসতভিটে দলিল-দস্তাবেজ না থাকার ভয় দেখিয়ে শ্মশানে মৃতদেহ পোড়ানো নিষেধের হুমকি দিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, ভোটের আগে প্রচার স্বরূপ কুমোরপাড়ায় অজয় মণ্ডলের উঠানে মিটিংয়ে আয়োজন করে আবুল কাশেম। সেখানে আবুল কাশেম জাতীয় নির্বাচনে তার দলকে ভোট দেওয়ার কথা বলে কুমোর-মালোদের। আবুলের কথায় অনুরোধের চিহ্ন থাকে না বরং তা আদেশ হয়ে ওঠে। চেয়ারম্যানের কথায় অন্যান্য কুমোর-মালোরা চুপ থাকলেও কুন্তী প্রতিবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে।

> ‘‘আপনার প্রস্তাবে আমরা রাজি না। কারে ভোট দিব, হেইডা আপনারে কমু না। কারে ভোট দিমু না-দিমু, তা ঠিক কইরে দেওনর আপনি কেডা?’ (জলদাস ২০২১ পৃ. ১১৩)

কুন্তীর এই প্রতিক্রিয়ায় শহিদুল তাকে গালাগাল করে হুমকি দিলে তৎক্ষণাৎ আবুল মেকি ব্যবহারে মালোদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেয়, কারণ মালোদের ভোট তার দলের প্রয়োজন। তাই মালোদের না চটিয়ে তাদের ভোট দেওয়ার কথা বলে আবুল সেখান থেকে সরে পড়ে। গল্পে দেখা যায়, সেই রাতে অজয় মণ্ডল ভেদবমিতে মারা যায়। তার মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই আবুল কাশেম ও তার দলবল শ্মশানে আসে। কারণ আবুল কাশেম এই শ্মশানে মৃতদেহ পোড়াতে নিষেধ করেছিল। সেই নিষেধ অমান্য করলে মালুদের তিনি মরা অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে বলে। আবুলের এই অন্যায় বাধাদানে কুন্তী আবারও গর্জে ওঠে-

> ‘বন্ধ কইরব না।... এইডা আমাগোর জাগা, এই শ্মশান আমাগোর। এই ভূমি আমাগো কাছে মায়ের সমান পবিত্র। এই জাগা ছাড়ুম না আমরা। দেখি আপনি কী কইরতে পারেন।’ (জলদাস ২০২১, পৃ. ১১৭)

কুন্তীর আবুলের বিরুদ্ধে এই প্রতিস্পর্ধা ও প্রতিক্রিয়ায় আবুল বলপ্রয়োগ করে জোর জবরদস্তির পথ অবলম্বন করেছে। যা আধিপত্যবাদী শ্রেণির আরো একটি বৈশিষ্ট্য। ফলে ক্ষমতার শৃঙ্খলা আমরা কী ইতিহাসের ঘটনাবলিতে, কী আখ্যানের ঘটনায়—উচ্চবর্গের আধিপত্যের বিপরীতে নিম্নবর্গের প্রতিবাদী চেতনাকে জাগরিত হতে দেখেছি।

অন্যদিকে ‘দুলারী এবং কয়েকজন’ গল্পে একজন জেলে নারীর করুণ পরিণতির মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে দুলারী জলদাসের প্রতিবাদী চেতনা। স্বামী শ্যামল দ্বারা এই অন্যায় ও বঞ্চনায় দুলারী প্রায় উন্মাদিনী হয়ে গর্জে ওঠে। একজন নারীর বল প্রয়োগের ক্ষমতা সীমিত বলে সে শ্যামলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেও শ্যামলকে শাস্তি দিতে পারে না। তাই দুলারীকে প্রচন্ড একটা চড় মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছে শ্যামল। তার নির্জল চোখে ক্রোধের উন্মত্ততা। ফলে দৃঢ়তার সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে দুলারী হিংস্র কণ্ঠে শ্যামলকে জানায় -

> ‘শুয়োরের বাইচ্চা শ্যামইলা! আমার খাইয়া, আমার লগে ফুইত্যা, গায়ে বাতাস লাগাইয়া কাটাইছস এতদিন। এখন আমার ঘর থেইক্যা বাইর অইয়া যা খানকির পোলা। ঝাঁটার বাড়ি দেওনর আগে বাইর হ।’
>
> (জলদাস ২০১৬ (ক) পৃ. ৯৪)

আমরা জানি দুলারির উপার্জনের উৎস আছে, সে তুলনায় শ্যামল বেকার। এতদিন দুলালীর উপার্জন নিজের ভরণপোষণ চালিয়েছে সে বিনা পরিশ্রমে। ফলে দুলারী আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তা রয়েছে একা পথ চলার। সেই দৃঢ়তাই দুলারিকে প্রতিবাদে সাহস জুগিয়েছে। শ্যামলকে ঘর থেকে বের হয়ে যেতে বলার মধ্য দিয়ে নিজের আত্মসম্মান বজায় রাখার চেষ্টা, দুলারিকে একজন প্রতিবাদী নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

তাহলে, ইতিহাস থেকে শুরু করে বর্তমান কালখন্ডের প্রেক্ষাপটে আমরা এ সত্য অনুধাবন করলাম যে, আধিপত্যকামীরা তাদের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য বলপ্রয়োগ থেকে শুরু করে প্ররোচনার আশ্রয় পর্যন্ত নেয় এবং অধীনস্তরা সেই অন্যায়ভাবে স্বার্থসিদ্ধি করার পথে কখনো এককভাবে বা কখনো সম্মিলিতভাবে তার বিরুদ্ধতা করে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী। প্রশ্ন জাগে, কেন নিম্নবর্গকে বারবার বিরোধিতা প্রতিবাদের রাস্তা বেছে নিতে হয়? কারণ নিম্নবর্গের কণ্ঠস্বর বা দাবির কোনো অস্তিত্ব সৃষ্টি হয় না উচ্চবর্গের কাছে। তাই খুব স্বাভাবিক কারণেই গায়ত্রী চক্রবর্তীর মনে হয়েছে সাবঅলটার্ন শব্দটি তার ক্ষমতা হারাচ্ছে। কারণ সমাজের যে কোনো গোষ্ঠীর কাছে নিম্নবর্গ শুধু একটি গুঞ্জনে পরিণত হয়েছে- যারা আসলে কিছুই নয়। স্পিভাকের মন্তব্য-

> ‘Thus an emotional response against this discrediting is misplaced, especialy when the kinds of groups that are claimed to be subaltern are simply groups that feel subordinal in any way. I think the word “subaltern” is losing its definitive power because it has become a kind of buzzword for any group that wants something that it does not have.’ (Landry (eds.) 1996, p. 290)

অর্থাৎ এক গোষ্ঠীর মানুষের কাছে যদি আরেক গোষ্ঠীর মানুষ অস্তিত্ব সম্পন্ন না হয়, তাহলে তাদের ওপর বয়ে আসা বিভিন্ন অন্যায়-বঞ্চনা-শোষণ-যন্ত্রনা কীভাবে অন্য গোষ্ঠীর মানুষেরা অনুধাবন করবে। তাই বাধ্য হয়ে বঞ্চিত, নিপীড়িত শ্রেণি তাদের অস্তিত্বের জানান দিতেই অপরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে বারবার। আর সেই প্রতিবাদের প্রাথমিক পদক্ষেপ ধরা পড়েছে নিম্নবর্গের সোচ্চার মৌখিক প্রতিক্রিয়া মধ্য দিয়ে।

কথাবিশ্বে নিম্নবর্গীয় নারীর কেবল সোচ্চার প্রতিবাদই নয়, অবস্থা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী আঘাতও করেছে। সে আঘাত কখনো প্রতিরোধজনিত, কখনো আত্মসম্মান রক্ষার্থে, আবার কখনো গর্হিত অন্যায়ের শাস্তি উদ্দেশ্যে। ‘জলপুত্র’ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্র ভুবনেশ্বরীর প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই সমগ্র উপন্যাসের প্রথম প্রতিবাদের সূত্রপাত হয়েছে। কাহিনি অনুসারে চরপাড়ার জোনাব আলীর বাবা সমুদ্রে যাওয়ার একমাত্র রাস্তাটির মালকানা দাবি করে জেলেদের কাছ থেকে বিনামূল্যে মাছ নেয়, অস্বীকার করলে কেড়ে নেয়। এরকমই একদিন বংশীর মা, গঙ্গার মা, মালতির মা ও গুড়াবি সমুদ্রতট থেকে খাড়াং ভর্তি মাছ কিনে বাজারের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে জোনাবের বাবার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। বংশীর মা মাছ দিতে অস্বীকার করলে জোনাবের বাবা এক ধাক্কায় বংশীর মা-র মাথা থেকে মাছ ভর্তি খাড়াং মাটিতে ফেলে দেয়। বংশীর মার প্রতি এই অন্যায় হতে দেখে ভুবনেশ্বরী নিজেকে আটকে রাখতে

পারে না। জোনাব আলীর বাবাকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভুবন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। উপন্যাসের বর্ণনা অনুযায়ী-

> ‘তোর বাপদাদারে লের দিতাম। মাইয়াপোয়ার গাআত্ হাত!’ বলতে বলতে সারাজীবনের নিরীহ ভুবন পেছন থেকে জোনাব আলীর বাপের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তার দেখাদেখি অন্য তিন জেলেনিও নিস্ক্রিয় থাকল না। খামচি, নখের আঁচড়, থাপ্পড় দিতে দিতে জোনাব আলীর বাপকে মাটিতে শুইয়ে দিল। গায়ের গেঞ্জি ছিঁড়ে একাকার। লুঙ্গিটা দুই হাতে ধরে আব্রু রক্ষা করছে জোনাব আলীর বাপ।’ (জলদাস ২০০৮, পৃ.৬৮)

হরিশংকর-এর কথাসাহিত্যে বর্ণিত সমাজে যে নারীর সম্মানের গুরুত্ব সর্বাধিক তা আমরা পূর্বেই জেনেছি। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে নারীদের সম্মান দিয়ে এসেছে, তাদের মান-সম্মান রক্ষার্থে সুরক্ষা প্রদান করেছে। কিন্তু জোনাব আলীর বাবার অন্যায় কর্ম ও বংশীর মাকে লাঞ্ছিত করার অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কোনো পুরুষের প্রয়োজন হয়নি ভুবনদের। জোনাব আলীর বাবার দ্বারা আঘাত ও অসম্মানের যোগ্য জবাব হিসেবে নারী শক্তির জাগরণ হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই। তাই স্বাভাবিকভাবেই জোনাবের বাবার প্রতি ভুবনদের প্রতিরোধের ঘটনাটি জেলেপাড়ায় চাপা উল্লাস অনুভব করে। উপন্যাস বর্ণনায়,

> ‘সমস্তজীবন মারখাওয়া জেলেসমাজের চারজন নারী আজ জেলেদের দীর্ঘদিনের অপমানের প্রতিশোধ নিয়েছে। শক্ত সমর্থ অর্থবান জেলেরা যা এতদিন করতে পারেনি, আজ চারজন নিঃস্ব হতদরিদ্র জেলেনারী তা করেছে। ...প্রায় গোটাটা জীবন যে শুধুই মার খেয়ে গেছে নিয়তির হাতে, সে নারীটিই আজ জেগে উঠেছে।’ (জলদাস ২০০৮, পৃ.৬৯)

একটু গভীরে লক্ষ করলে বোঝা যাবে, আধিপত্যকামীদের স্বার্থসিদ্ধির শক্তি লুকিয়ে আছে তথাকথিত নিম্নবর্গের নিষ্ক্রিয়তায়। এই নিষ্ক্রিয়তাই ডমিন্যান্ট শ্রেণির মনে ‘নিম্নবর্গ কিছুই না’—ধারণাটিকে বিশ্বাসে পরিণত করে। কিন্তু আমরা জানি নিম্নবর্গীয় চেতনায় প্রতিবাদী মুহূর্তটি তথাকথিত ক্ষমতাবান উচ্চবর্গের কাছে তাদের অস্তিত্বের সত্তাকে ঘোষণা করে। ফলে ভুবেনেশ্বরীর সারা জীবনের নিরীহ থাকার মানসিকতা এক মুহূর্তে উবে গিয়েছে জোনাব আলীর বাবার হাতে আর একজন নারীর লাঞ্ছনার ঘটনায়।

সামাজিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে ঘটনা পরম্পরায় এমন কিছু ঘটনা ঘটে থাকে যার ব্যাখ্যা সব সময় ইতিহাস বা তত্ত্ব মেনে চলে না। যেমন আমরা ‘কসবি’ উপন্যাসের দেবযানী চরিত্রের ক্ষেত্রে লক্ষ করেছি। আলোচ্য উপন্যাসের কাহিনির একেবারে শেষে এসে আমরা দেখলাম পতিতাপল্লির হর্তাকর্তা স্বার্থান্বেষী অত্যাচারী কালুসর্দার জনসাধারণের সমক্ষে দেবযানীর হাতে খুন হচ্ছে। দেবযানীর কালু সর্দারকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার মতো পদক্ষেপ নেওয়ার পেছনে রয়েছে একজন সাধারণ জেলে

কন্যা কৃষ্ণার পরিস্থিতির শিকারে পতিতা হয়ে ওঠার যাত্রাপথে। সেই যাত্রাপথের সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখের মধ্য দিয়ে আমরা বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব একজন নারীর প্রতিবাদের চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানোর কারণ।

প্রথমত, দেবযানী ছিল একজন জেলেকন্যা। মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর পিতা অর্ধউন্মাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ফলে আর্থিক সংকটে পড়ে তার পরিবার। পাড়া প্রতিবেশীর কেউ তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে না।

দ্বিতীয়ত, অর্থসংকটে কৃষ্ণ বাধ্য হয়ে স্টেশন চত্বরে ফলবিক্রেতা তপনের কাছে সাহায্য চায়। কিন্তু সাহায্যের বদলে তপন কৃষ্ণার শরীর উপভোগ করে।

তৃতীয়ত , তপনকে বিয়ে করার জন্য জোরাজুরি করলে তার সঙ্গে কৃষ্ণা পালিয়ে যায় চট্টগ্রামে।

চতুর্থত, কৃষ্ণাকে নিয়ে চট্টগ্রামের এক হোটেলে ওঠে তপন। সেখানে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে কৃষ্ণের শরীর বারংবার উপভোগ করে। পরদিন সকালে কৃষ্ণাকে না জানিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যায় তপন।

পঞ্চমত, হোটেলে সারা রাত কাটানো কৃষ্ণা তপনকে খুঁজতে থাকে। হোটেল কর্তার বুঝতে অসুবিধা হয় না যে কৃষ্ণাকে ঠকিয়ে তার শরীর ভোগ করে কেউ চলে গেছে। সে তৎক্ষণাৎ সাহেব পাড়ার পতিতাপল্লির দালাল শামছুকে ডেকে কৃষ্ণাকে তার কাছে বিক্রি করে দেয়।

ষষ্ঠত, শামছু হোটেল থেকে কৃষ্ণকে নিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার নাম করে সাহেবপাড়ায় কালু সর্দারর কাছে চড়া দামে বিক্রি করে। তারপর জেলেপাড়ার এক সাধারণ কন্যা কৃষ্ণার পতিতা জীবনের আরম্ভ।

সপ্তমত, ধীরে ধীরে পতিতা জীবনে অভ্যস্ত কৃষ্ণা পতিতাপল্লির রূপসী পতিতা দেবযানীতে পরিণত হয়। কিন্তু ঘটনাচক্রে তার কঠিন সিফিলিস রোগ ধরা পড়ে। সাহায্য ও চিকিৎসা করানোর বদলে গলাধাক্কা মেরে কালুসর্দার তাড়িয়ে দেয় দেবযানীকে।

অষ্টমত, মোহিনী মাসি রোগগ্রস্ত দেবযানীকে উন্নত চিকিৎসার মধ্যে দিয়ে নবজীবন দান করে। কিন্তু বদলে মোহিনীর হয়ে পতিতাবৃত্তির নির্দেশ দিলে দেবযানী পুনরায় পতিতা জীবনচক্রে বাঁধা পড়ে যায়।

এই ঘটনার পর মোহিনী মাসির প্রতি তার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা বোধ জন্মেছিল। দেবযানী মোহিনী মাসির পুত্রশোক ও একাকীত্ব সহ্য করতে পারেনি। সারাজীবনের গ্লানি, বিশ্বাসঘাতকতা, অপমান-নিপীড়নের সমস্ত ক্ষোভ কালু সর্দারের প্রতি তীব্র এক প্রতিশোধস্পৃহার জাগরণ ঘটায় তার মনে। কিন্তু সে জানে কালুকে উচিত শিক্ষা দেওয়া ও কৈলাস হত্যার প্রতিশোধ নেওয়া সহজ নয়। কারণ কালু ক্ষমতাবান। তার আছে অর্থ ও বাহুবল। কিন্তু পরদিন মন্দিরের পুরোহিতের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কালু সর্দার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলে দেবযানী বুঝে যায়, শুধু গ্রেপ্তারী বা জেলের বন্দিদশাই কালুর শাস্তি হতে

পারে না। তার অপরাধ আরো গুরুতর। তাই পতিতাপল্লির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এক বৃহত্তর রূপান্তর কল্পনা করে দেবযানী সর্বসমক্ষে কালুকে খুন করে।

> 'পুলিশ কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেবযানী কালুকে জড়িয়ে ধরল।
>
> কালুর মুখ দিয়ে 'ঘোঁৎ' করে একটা আওয়াজ বেরোলো। পুলিশ তড়িৎ বেগে কালুর কাছ থেকে দেবযানীকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলল।
>
> সবাই দেখল- দেবযানীর হাতে একটা ছোরা। সেই ছোরা এবং দেবযানীর হাত- বুক- পেট রক্তে ভেসে যাচ্ছে। (জলদাস ২০১১, পৃ. ১৬৭-৬৮)

প্রায় এই রকমই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমরা লক্ষ করি 'মোহনা' উপন্যাসের মোহনা চরিত্রের ক্ষেত্রে। কৈবর্তরা কীভাবে ভীমসেনের নেতৃত্বে পালরাজাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করেছিল- তার বর্ণনার পাশপাশি উপকাহিনি হিসেবে সংযুক্ত হয়েছে ভীমসেনের পালিতপুত্র চণ্ডক ও বারাঙ্গনাপল্লির পতিতা মোহনার প্রেম কাহিনি। বস্তুত, আলোচ্য উপন্যাসে মোহনার ভূমিকা একজন সাধারণ বারবণিতার হলেও কাহিনির সমাপ্তি ঘটেছে মোহনার প্রতিশোধের মধ্য দিয়ে। কাহিনি অনুযায়ী ভীমের পালিত পুত্র চণ্ডক ভীমকে পিতা হিসেবে মান্য করলেও সংকটের চরম মুহূর্তে সে পাল রাজাদের সেনাপ্রধান হওয়ার লোভে তাদের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্র করে কৈবর্ত রাজ ভীমের মৃত্যুর কারণ হয়। যে প্রেম ও স্নেহ-মমতা দিয়ে ভীম চণ্ডককে বড়ো করে নতুন জীবন দান করেছিল তার মূল্য চণ্ডকের স্বার্থপরতার কাছে শূন্য। ফলে ঘটনাক্রমে পালরাজ রামপাল বরেন্দ্রভূমি দখল করলে কৈবর্ত রাজ্যের সকল বাসিন্দা রাজ্যত্যাগ ও পলায়নে তৎপর হয়ে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যে বারাঙ্গনাপল্লিও জনশূন্য হয়ে পড়ে। কিন্তু মোহনা থেকে যায় চণ্ডকের অপেক্ষায়। চণ্ডকের প্রতি তার ঘৃণা ও প্রতিশোধ স্পৃহার মানসিকতা বুঝতে পারে না কেউ। এমন পরিস্থিতিতে চণ্ডক পালরাজ্য রামাবতীতে যাওয়ার জন্য মোহনার কাছে অনুমতি চেয়ে বলে,

> 'কালকে আমার পুরস্কার পাবার দিন। সমস্ত জীবনটাই কেটে গেল কৈবর্তদের দাসত্ব করতে করতে। কৈবর্তরা নীচ জাত। পালরা রাজার জাত। এই রাজ বংশের বিশাল বাহিনীর সেনা প্রধান হব আমি।' (জলদাস ২০১৩, পৃ. ১২৭)

চণ্ডকের অকপট বিশ্বাসঘাতকতার স্বীকারোক্তি মোহনার মনে তার প্রতি সমস্ত দুর্বলতাকে ধুলিস্যাৎ করে দেয়। কারণ মোহনা বুঝতে পারে, যে মহান দয়ালু রাজা একজন জারজ সন্তানকে নিজের পুত্রের সম্মান দিয়েছিল তার প্রতি যদি চণ্ডক এমন নির্দয় ও নির্মম বিশ্বাসহন্তায় পরিণত হতে পারে, তাহলে মোহনার মতো সামান্য বারাঙ্গনা তো তার পায়ের ধুলো। আসলে মোহনার প্রতি চন্ডকের ভালোবাসা দৈহিক আকর্ষণজনিত। যৌবনহারা মোহনা চণ্ডকের কাছে মূল্যহীন। তাই মোহনার আত্মসম্মান ও স্বাভিমান চণ্ডকের থেকেও বড়ো হয়ে উঠেছে। মোহনার মনে হয়েছে, এত বড়ো অন্যায় অপরাধ করার পর চণ্ডকের

মতো বিশ্বাসঘাতক এত সহজে মুক্তি পেতে পারে না। এ পৃথিবীতে বিশ্বাসঘাতকের কোনো স্থান নেই। তাই তো চণ্ডকের রামপালের কাছে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য পুরস্কার নিতে যাওয়ার প্রসঙ্গে মোহনা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে গর্জে ওঠে-

> 'তোর আসল পুরস্কারটা নিয়ে যা রে, চণ্ডক। তোরে এই পুরষ্কার দেওয়ার জন্য আমি পালিয়ে যাই নাই। অধীর আগ্রহে তোর জন্য প্রতীক্ষা করেছি।'
>
> '.... মোহনা; কী করছ, কী করছ, মোহনা?' বলতে চাইলে চণ্ডক। তার আগেই চণ্ডকের মস্তক বরাবর মোহনার হাতের বঁটিটি নেমে এল। ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল মোহনার ভালোবাসার চণ্ডক, মোহনার ঘৃণার চণ্ডক।'
>
> (জলদাস ২০১৩, পৃ.১২৮)

মোহনার এই আঘাতের উদ্দেশ্য চণ্ডকের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া তো বটেই, পাশাপাশি নিজের আত্মশুদ্ধি ও আত্মসন্তুষ্টির জন্যও চণ্ডকের বিরুদ্ধে শাস্তি স্বরূপ প্রতিরোধ করেছে সে। আর এই প্রতিবাদী মুহূর্তই নিম্নবর্গীয় চেতনার অস্তিত্ব ঘোষণা করেছে।

'থুতু' গল্পে দেখা যায় শামসু মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে গুলির আঘাতে পঙ্গু হয়ে বাড়ি ফেরে। মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার কারণে তাদের বাড়ি থেকে উৎখাত করে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বশির উদ্দিন। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে বাধ্য হয়ে বস্তিতে আশ্রয় নেয় শামসু। সেই বস্তিতে থাকাকালীন এক দুপুরে দুর্ঘটনাটি ঘটে। গল্প অনুযায়ী,

> 'ফারহানা তখন ক্লাস এইটে পড়ে। দুপুর ছুটিতে ভাত খেতে এসেছে ঘরে। দুপুরে বাপ ভিক্ষায়, মা ঝি গিরিতে। মাথা নিচু করে ডালের সঙ্গে ভাত মাখছে ফারহানা। ওই সময় পাশের ঝুপড়ির সিরাজের বাপ ঘরে ঢোকে। ঝাপটে ধরে ফারহানাকে। মাটিতে চেপে ধরার আগে পানি ভর্তি গ্লাস দিয়ে সিরাজের বাপের কপালে আঘাত করে ফারহানা। 'অ-মারে' বলে দ্রুত ঝুপড়ি থেকে বের হয়ে যায় সিরাজের বাপ। কপাল ফাটে না, কিন্তু আস্ত একটা সুপারি জেগে ওঠে তার কপালে।' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ২১৯-২০)

তাহলে দেখা যাচ্ছে, যে নারীকে দুর্বল ও অবলা বলে ঘরের চার দেয়ালে বন্দি জীব হিসেবে দেখা হয়, তা আসলে পাঠ্য ভিত্তিক। আসলে অস্তিত্ব ও আত্মসম্মানে আঘাত করা হলে, নারী পরিস্থিতি ও প্রয়োজন অনুযায়ী যেমন প্রতিক্রিয়া করেছে, তেমনই প্রত্যাঘাতও করেছে। সব ক্ষেত্রে নারী স্পিভাকের মন্তব্য অনুযায়ী 'Mute forever' নয়। হরিশংকরের কথাসাহিত্যে যে তথাকথিত নিম্নবর্গীয় সমাজ উঠে এসেছে সেখানে নারীর অবস্থান অনুসারে তাদের প্রতিশোধস্পৃহা প্রতিবাদেরই একটি স্বরূপ হিসেবে দেখা দিয়েছে। যদিও এই প্রতিশোধস্পৃহার প্রতিক্রিয়া সব ক্ষেত্রে সমান নয়। কখনো তা সুপরিকল্পিত, কখনো স্বতঃস্ফূর্ত, কখনো তাৎক্ষণিকভাবে দেখা গিয়েছে।

'কসবি' উপন্যাসে মোহিনী মাসি ও দেবযানীর সুপরিকল্পিত প্রতিবাদ লক্ষ করেছি। অত্যাচারী কালুসর্দার মোহিনীকে জব্দ করার লক্ষ্যে রহিজ পাগলকে দিয়ে জেলে-জেলেনী সম্পর্কিত একটি অপমানকর গান শিখিয়ে দিয়ে প্রত্যেকদিন মোহিনীর বাড়ির সামনে এই গান গাওয়ায়। দেখা যায়, কালু যে গান দিয়ে ও যাকে দিয়ে গান গাইয়ে তাকে অপমান অপদস্ত করতে চেয়েছে ঠিক একইভাবে মোহিনী মাসিও রহিজ পাগলকে দুবেলা ভরপেট খাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে কালু সর্দারের বাড়ির সামনে একটি গান গাইতে বলে। মোহিনী জানে কালু সর্দারের বাড়ির কোনো পতিতার সিফিলিস রোগ ধরা পড়েছে যা মারাত্মক ও সংক্রামক। সেই রোগ সংক্রান্ত গান শিখিয়ে মোহিনী রহিজকে তাই বলে-

> 'ভাত আমি তোমাকে দেবো দুই বেলা। তবে কামটা মন দিয়ে করে দিতে হবে তোমাকে। কাল সন্ধ্যে থেকে কাস্টমাররা যখন আসতে শুরু করবে, তখন সর্দারের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলবে—সর্দার বাড়ির মাইয়াগোর শরীলে সিফিলিস। নির্ভয়ে বলবে, চিৎকার করে বলবে। পারবে না?' তারপর প্রেমদাশের দিকে তাকিয়ে বলল, 'রহিজ পাগলারে ট্রেনিং দিয়ে তৈয়ার করে নাও প্রেমদাশ।' (জলদাস ২০১১, পৃ. ৯৯)

মোহিনীর এই সুপরিকল্পিত বুদ্ধিমত্তায় প্রেমদাশ বিস্মিত হয়। কোনো মারপিট নয়, শুধু বুদ্ধির খেলা। আর এই বুদ্ধির খেলা যখন ফলপ্রসূ হল, তখন দেখা গেল, রহিজের এই গানে প্রভাবিত হয়ে সর্দারের গেটের সামনে থেকে কাস্টমাররা একে একে সরে পড়ে। এই ঘটনার পর কালুসর্দারের সমূহ ক্ষতি হয়। কাস্টমাররা সযত্নে কালুর বাড়ি এড়িয়ে চলে। কারণ সিফিলিস রোগ এতটাই সংক্রামক ও মারাত্মক যা কাস্টমারদের মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি করেছে। রাগে দুঃখে ক্ষোভে সর্দার যখন নিরুপায় তখন দোতলা থেকে মোহিনী মুচকি হেসে বলে-

> 'জাইল্যানির বুদ্ধি তো টের পাওনি শৈলবালা দত্তের পোলা? এখন বসে বসে নিজের বুড়ো আঙুল চোষ আর কুত্তার বিচা কচলাও।' (জলদাস ২০১১, পৃ. ১০১)

মোহিনীর বুদ্ধি ও সুপরিকল্পিত প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা কালু সর্দার না পেলেও আমরা তা অনুধাবন করেছি। একজন জেলেনারীর এধরনের বুদ্ধিমত্তা ও ক্ষমতার পরিচয় প্রমাণ করে নিম্নবর্গীয় নারী সবক্ষেত্রে নীরব নয়। সুযোগ পেলে একজন নারী ও তার ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারে।

আবার 'ঢেন্ডেরি' গল্পে দেখি জেলেনারী লক্ষ্মীবালা তার দুশ্চরিত্র স্বামী রাইগোপালের অন্যায় ও বঞ্চনার শাস্তি স্বরূপ পরিকল্পিত প্রতিশোধ নিয়েছে। গল্প অনুযায়ী লক্ষ্মীবালা স্ত্রী হিসেবে রাইগোপালের প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত। কিন্তু রাইগোপাল স্ত্রীর প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করেছে। স্বামীর অবহেলা ও দুশ্চরিত্রতার কষ্ট চেপে রেখে লক্ষ্মীবালা সংসার সামলায়। রাইগোপালের অবৈধ সম্পর্কের ব্যাপারে কোনো লজ্জাবোধ নেই। দিনের পর দিন স্বামী দ্বারা বঞ্চিত-প্রত্যাখ্যাত হতে হতে লক্ষ্মীবালার মনে প্রতিশোধস্পৃহা

জেগে ওঠে। একদিন ঘটনাচক্রে হরিদাসীর মা তার কষ্টের কারণ জানতে পারলে সে লক্ষ্মীবালাকে পরামর্শ দেয়-

> 'তোঁয়ারার সমাজ বঅর কড়া। এই রইম্যা কামত্ ধরা পইল্যা ঢেন্ডেরি। তুঁই গবিন্দ সর্দারের লগে দেখা গর। তাঁই ভালা মানুষ। একখান সৎ পরামর্শ দিব।' (জলদাস ২০১৬ (ক) পৃ. ৫৬)

হরিদাসীর মার কথায় ভরসা পেয়ে লক্ষ্মীর প্রতিশোধের সংকল্প দৃঢ় হয়। সে স্বামীর অনুপস্থিতিতে গোবিন্দ সর্দারের কাছে সাহায্য চাইতে গেলে তিনি লক্ষীবালাকে স্বামীর কুকীর্তির প্রমাণ দিতে বলে। লক্ষ্মী তৎক্ষণাৎ বলে ওঠে-

> 'পাইয্যম। হাতেনাতে ধরাই দিত পাইয্যম।' (জলদাস ২০১৬ (ক) পৃ. ৫৬)

দেখা গেল, গোবিন্দ সর্দার ও লক্ষ্মীর পরামর্শ অনুযায়ী সেইরাতে সর্দার তার দলবল নিয়ে আঙুরবালার বাড়িতে হানা দেয়। লক্ষীর কথা অনুযায়ী রাইগোপাল ও আঙুরবালা রান্নাঘর থেকে আপত্তিজনক অবস্থায় ধরা পড়ে। ফলে জেলেসমাজের অনুশাসন অনুযায়ী তাদের ঢেন্ডেরি শাস্তি দেওয়া হয়।

অন্যদিকে 'শেফালি' গল্পে শেফালির প্রতিশোধমূলক প্রতিক্রিয়াটি স্বতঃস্ফূর্ত ও তাৎক্ষণিক। গল্পে দেখা যায়, শেফালী একজন নামকরা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সাধারণ ক্লার্ক। সেই কোম্পানির বড়ো সাহেবের ছোবহানের নজর পড়ে শেফালির ওপর। কারণে-অকারণে তাকে ডেকে পাঠান এবং ফাইলপত্র খুঁজে দেওয়ার নাম করে -

> 'ছোবহান সাহেব শাফালির হাতে-বাহুতে-নিতম্বে-জানুতে হাত ছোঁয়ান।' (জলদাস ২০১৯ (খ) পৃ. ১৫২)

ছোবহানের এই ধরনের কু-আচরণের কথা অফিসের কমবেশি সকলেই জানে। কিন্তু শেফালির প্রতি তার কুৎসিত ও লোলুপ দৃষ্টির গভীরতা দিন দিন বেড়েই চলছিল। ফলে শেফালির সহ্যের সীমা পার হতে থাকে। এরকমই একদিন ফাইল খোঁজার নামে সে শেফালির স্তনের দিকে তাকিয়ে থাকে। এরকম অবস্থায় তৎক্ষণাৎ শেফালি গর্জে ওঠে-

> 'স্যার আমার বুক দেখতে চান? এই দেখুন।' বলে সে ব্লাউজের একটা বোতাম খুলে ফেলল।'
>
> (জলদাস ২০১৯ (খ) পৃ. ২৫৩)

শেফালির আচরণে ও চিৎকারে বড়ো সাহেবের অফিস ঘরের সামনে অফিস স্টাফ জড়ো হতে শুরু করে। লোকজন জড়ো হতেই সে আবারও ক্ষুব্ধ গলায় বলে ওঠে,

> 'আপনার চোখ থেকে বাঁচার জন্য শাড়ি ব্লাউজ ধরেছি। তারপরও নিস্তার পাচ্ছি না। দেখুন স্যার এই দেখুন- আপনার বউয়ের চেয়ে কত পার্থক্য দেখে নিন।' বলে ফটাফট করে ব্লাউজের বোতাম খোলা শুরু করল শেফালি।'
>
> (জলদাস ২০১৯ (খ) পৃ. ২৫৪)

শেফালির এই আচরণে অপ্রস্তুত ছোবহান সাহেব অফিসের সামনে মান-সম্মানহানির ভয়ে কুঁকড়ে গিয়ে হাত জোড় করে শেফালির কাছে ক্ষমা চেয়েছেন। গল্পে দেখি-

> ‘আবদুস ছোবহান মরা কণ্ঠে বলে উঠলেন, ‘দোহাই শেফালি। মাফ করো আমায়। থামো তুমি। মাথা নিচু করলেন বড়ো সাহেব। (জলদাস ২০১৯ (খ) পৃ.২৫৪)

তাহলে দেখা গেল, অন্যায় বঞ্চনা শোষণের বিরুদ্ধে কেবল বল প্রয়োগ বা মৌখিক প্রতিক্রিয়ায় নয় বুদ্ধিমত্তারও প্রয়োগ ঘটিয়েছে নারীরা। তাই এক্ষেত্রে বলতেই হয় গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক নিম্নবর্গীয় নারীকেই ‘mute forever’ বলুন না কেন ক্ষেত্রবিশেষে নারীকে আমরা প্রতিক্রিয়া, প্রতিরোধ ও প্রতিশোধে তৎপর হতে দেখেছি। বরং হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে নারীর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় অনেকাংশেই পুরুষদের তুলনায় সক্রিয় ও ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছে।

৫.৩.২ নারীর আত্মহত্যা : প্রতিবাদের ভিন্ন স্বরূপ

‘দহনকাল’-এর রাধেশ্যামের বউ, ‘কুন্তীর বস্ত্রহরণ’-এর কুন্তী, ‘চিঠি’ গল্পের নামহীন কিশোরীরা কেউ ধর্ষিত, কেউ লাঞ্ছিত, কেউ আত্মরক্ষার জন্য সর্বোপরি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত হতে ব্যর্থ হওয়ায় তারা আত্মহত্যার মতো চূড়ান্ত পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে ঘটনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে উল্লেখ্য আত্মহত্যার পরিণামকে কখনোই পলায়নবাদী পদক্ষেপ বলা যাবে না। বরং আখ্যানের প্রয়োজন ও সমাজ বাস্তবতা উভয় ক্ষেত্রেই এই আত্মহত্যার ঘটনাগুলি আসলে প্রতিবাদের বিবৃতি হয়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় ইলায়েন শোওয়াল্টার ‘A literature of their own’ শিরোনামের বক্তৃতায় বলেন,

> ‘Suicide become a grotesquely fantasized female weapon, a way of cheating men out of dominance. Martyrdom and self immolation are viewed as aggressive, as a way of inflicting punishment on the guilty survivors.’ (Showalter 1977, p. 250)

অর্থাৎ আত্মহত্যা একটি ভয়ঙ্কর কল্পনাপ্রসূত অস্ত্র হিসেবে মহিলা দ্বারা ব্যবহৃত হতে পারে যখন কোনো পুরুষ দ্বারা নারী প্রতারিত-ধর্ষিত বা অন্য কোনোভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়। আসলে আত্মহননকে আক্রমণাত্মক হিসেবে দেখা হয় যা আত্মহননকারী দোষী জীবিতদের শাস্তি প্রদানের উপায় হিসেবে ব্যবহার করে। সেরকমই রাধেশ্যামের বউয়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম পাকসেনাদের দ্বারা স্বামীর অনুপস্থিতিতে যখন সে তার ঘরের মধ্যে বারংবার ধর্ষিত হয়েছে তখন ক্ষোভে-দুঃখে অভিমানে এবং অবশ্যই তার স্বামীর প্রতি ভালোবাসার মর্যাদা রাখতে আক্রমণাত্মক হয়ে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এই আত্মহত্যা যে সেই নারীর সম্মানহানি ও লজ্জাবোধের কারণে তা কিন্তু নয়। রাধেশ্যামের বউ বিয়ের পর থেকে সংগ্রাম

করে গিয়েছে। বহুদিন অভুক্ত দিন কাটিয়েছে। কিন্তু কোনোদিন এক মুহূর্তের জন্য স্বামীর প্রতি অবহেলা দেখায়নি সে। কিন্তু ধর্ষণের মতো এত বড়ো অপমান কীভাবে সহ্য করবে সে। তাই নিজেকে চিরতরে সরিয়ে নেওয়ার মধ্য দিয়ে রাধেশ্যামকে সে দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছে জীবিত দোষীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য। উপন্যাসের বর্ণনা অনুযায়ী,

> 'কিন্তু রাধেশ্যামের ওপর একটা কঠিন দায়িত্ব দিয়ে গেছে সে। নিজের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার দায়িত্ব। রাধেশ্যাম সেই রাতে ঠিক করে ফেলল-প্রতিশোধ নেবে সে, জীবনের বিনিময়ে হলেও বউয়ের অপমানের প্রতিশোধ তাকে নিতেই হবে।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ১৭৪)

রাধেশ্যামের বউয়ের আত্মহত্যার কারণে সারাজীবন প্রতিবাদহীন রাধেশ্যাম আজ প্রতিশোধস্পৃহায় জর্জরিত হয়েছে। তাই সামগ্রিক অর্থে একথা বলাই যায় যে, রাধেশ্যামের বউয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার সামর্থ্য ছিল না বলেই সে আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে 'জীবিত দোষী'-দের (guilty survivors) শাস্তি দেওয়ার উপায় অবলম্বন করে যা পরোক্ষভাবে নারী প্রতিবাদকেই চিহ্নিত করে।

'কুন্তীর বস্ত্রহরণ' উপন্যাসে লক্ষ করি চেঙ্গুটিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবুল কাশেম কুমোরদের শ্মশান দখল করতে চাইলে কুন্তী তীব্র প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু আবুল কাশেম হুমকি দেয় সেই শ্মশানে কেউ যেন আর মৃতদেহ না পোড়ায়। সেই রাতেই অজয় মণ্ডল মারা গেলে তাকে শ্মশানে পোড়াতে নিয়ে এসে কুমোররা আবুল কাশেম ও তার দলবলের সম্মুখীন হয়। কুমোর, মালোদের সঙ্গে তাদের হাতাহাতি শুরু হলে একটা সময় সোলাইমান ও ফখরে আলম কুন্তীকে ঘিরে ফেলে। দুজনে মিলে কুন্তীর শাড়ি খুলে দেয়। সোলাইমান কুন্তীর অবশিষ্ট বস্ত্র পেটিকোট খুলতে উদ্যত হলে সম্মানহানির চেয়ে মৃত্যুকে শ্রেয় বলে মনে করে কুন্তী। তাই,

> "কুন্তী চোখ বন্ধ করল। তার গলা চিড়ে বেরিয়ে এলো, 'ভগবান রে...।'
> আবুল কাশেম তার কাছে পৌঁছানোর আগে কাঁকরির জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল কুন্তী।" (জলদাস ২০২১, পৃ.১১৯)

এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, শোষণকারী আধিপত্যকামী আবুল কাশেমের দল চেয়েছিল কুন্তীর সম্মানহানির মধ্য দিয়ে তার প্রতিবাদী কণ্ঠকে রুদ্ধ করতে এবং অবশ্যই নিজস্ব ক্ষমতার আস্ফালনের মধ্য দিয়ে নিজের স্থানকে সুস্পষ্ট করতে। কিন্তু কুন্তী জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের প্রতিরোধ করেছে। নদীতে ঝাঁপ দিয়ে তাদের উদ্দেশ্যকে নস্যাৎ করে দিয়েছে সে। এখানেই কুন্তীর আত্মহত্যার পরোক্ষ প্রতিরোধ সফল হয়েছে।

অবশ্য 'চিঠি' গল্পে নামহীন কিশোরীর আত্মহত্যার ঘটনাটি সুপরিকল্পিত ও স্বতঃস্ফূর্ত। গল্পে দেখা যায়, কিশোরীটির জন্মমুহূর্ত থেকে সে পিতার কাছে অবহেলার পাত্রী। কারণ তার পিতা একজন

পুত্রসন্তান চেয়েছিলেন। কন্যার স্বাভাবিক জ্ঞান হওয়ার সময়ও সে এই বিষয়ে পিতা-মাতার মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি হতে দেখেছে। স্বাভাবিকভাবেই কিশোরীর মনে পিতা দ্বারা অবহেলার যন্ত্রণা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পিতার কন্যা সংক্রান্ত ভ্রান্ত ধারণা ভাঙতে শুরু করে। যে কন্যাকে কালো বলে পিতা কোনোদিন স্নেহের চোখে দেখেনি সেই পিতাই ধীরে ধীরে তার সমস্ত স্বপ্ন কন্যা দ্বারা পূরণ হতে দেখে সে মেয়েকে কাছে টেনে নিয়েছে। তার প্রতি সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছে। মেয়ের মেধাশক্তি প্রমাণিত হওয়ার পর তাকে ভালো স্কুলে ভর্তি করিয়েছে। মেয়েকে নিয়ে এক স্বপ্নের জগৎ তৈরি করেছে পিতা। কিন্তু স্কুলের ইংরেজি শিক্ষক হান্নান স্যারের কুদৃষ্টি পড়েছে কিশোরীটির ওপর। প্রাইভেট টিউশনি দেওয়ার নাম করে কিশোরীটিকে ধর্ষণ করেছে সে। এই ঘটনা মেয়েটির জীবনের সমস্ত আশা ভরসা ও আত্মবিশ্বাসকে নাড়িয়ে দেয়। সারাদিন নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করার পর সে সিদ্ধান্ত নয় আত্মহত্যার। লক্ষণীয় আত্মহত্যার কারণ হিসেবে সে যা চিঠিতে লেখে তার প্রথম অংশটি প্রতিবাদী চেতনাকে বোঝার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা সেই চিঠিতে জানলাম-

> ‘আমি গেলাম। আমার জন্যে আফসোস করো না।...কিন্তু আমি না গেলে আমার কষ্টের সঙ্গে তোমাদের মানে তুমি, মা এবং ছোটো ভাইটির বেদনা এবং লজ্জা মিশে গিয়ে আরো বড়ো বেশি একটা অপমানের জায়গা তৈরি হবে। ...জানাজানি হবার পর তুমি হয়ত ক্রোধে জ্বলে উঠবে। সর্বোচ্চ পণ করে আমার চলে যাওয়ার ব্যাপারে যে দায়ী তার বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করবে।’ (জলদাস ২০১৬ (ক) পৃ. ১২৭)

লক্ষণীয়, কিশোরীটি জানে সমস্ত সত্য ঘটনা জানাজানির পর তার বাবা সর্বস্ব পণ করে হান্নান স্যারের বিরুদ্ধে লড়াই করবে। তাইতো নিজের সীমিত শক্তির দ্বারা প্রতিবাদ-প্রতিশোধ সম্ভব নয় বলে পরোক্ষভাবে ‘জীবিত দোষী’-কে (Guilty survivors) শাস্তি দেওয়ার উপায় হিসেবে আত্মহত্যাকে বেছে নিয়েছে সে।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক নারী আত্মহত্যার বিষয়কে সামনে রেখে তাঁর ‘can the subaltern speak?’ প্রবন্ধে ভুবনেশ্বরী ভাদুড়ীর আত্মহত্যার ঘটনাকে ব্যাখ্যা করেছেন। যার মধ্য দিয়ে তিনি নারীর প্রতিবাদ স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। প্রবন্ধ অনুযায়ী জানা যায়, ষোল বা সতেরো বছর বয়সী এক যুবতী ভুবনেশ্বরী ভাদুড়ী ১৯২৬ সালে উত্তর কলকাতায় তার বাবার ফ্ল্যাটে আত্মহত্যা করেছিলেন। আত্মহত্যাটি একটি ধাঁধা ছিল কারণ মৃত্যুর মুহূর্তে তার ঋতুস্রাব হয়েছিল। এটা স্পষ্টতই অবৈধ গর্ভধারণের কোনো ঘটনা ছিল না। এই ঘটনার প্রায় এক দশক পর আবিষ্কৃত হয়েছিল যে, তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে জড়িত গোষ্ঠীর একজন সদস্য ছিলেন। সেই সময় তাকে একজন রাজনৈতিক ব্যক্তির হত্যার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি সেই দায়িত্ব

পালন করতে না পেরে তার আসল পরিচয় গোপন রাখার তাগিদে সচেতনভাবে সে নিজেকে হত্যা করেছিল। ভুবনেশ্বরী জানতেন যে, তার মৃত্যু অবৈধ আবেগের ফলাফল হিসেবে নির্ণয় করা হবে। তাই তিনি ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার নির্দিষ্ট দিনের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে নারীদেহে ঋতুস্রাবের সময় যে কষ্ট ও যন্ত্রণা সৃষ্টি হয় তা সহ্য করেও ভুবনেশ্বরী আত্মহত্যার জন্য অনুমোদিত উদ্দেশ্যকে সাধারণীকরণ করেছিলেন। (Morris (ed.) 2010, p.281-82)

স্পিভাকের মতে ইতিহাসে নারীর এই প্রতিবাদের আধিপত্যবাদী বিবরণের উদীয়মান ভিন্নমতের সম্ভাবনাগুলি ভালোভাবে নথিভুক্ত করা হলেও অপ্রকাশিত। তা শুধুমাত্র বক্তৃতার মাধ্যমে পুরুষ নেতারা স্মরণ করে জনগণের চেতনাকে জাগ্রত ও আকৃষ্ট করার জন্য। এর বাইরে নারীদের আত্ম বলিদানের ঘটনা ও মাহাত্ম্য নিম্নবর্গ হিসেবে কোথাও শ্রুত বা পঠিত হয় না-

> ‘The subaltern as female cannot be heard or read.’ (Morris (ed.) 2010, p.282)

হরিশংকর-এর কথাবিশ্বেও একইভাবে নারীদের আত্মহত্যার ঘটনাকেই বড়ো করে দেখা হয়েছে। আত্মহত্যার আড়ালে ও অলক্ষে যে রয়ে গিয়েছে তাদের পরোক্ষ প্রতিবাদ তা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাছে কখনো ধরা পড়েনি।

৫.৩.৩ নারীর নীরবতা : এক নিস্তব্ধ প্রতিবাদ

অন্যায়, শোষণ, বঞ্চনা বা নিপীড়নের বিরুদ্ধে সব ক্ষেত্রেই যে নিম্নবর্গীয় নারী প্রতিবাদ করেছে তা নয়। আসলে কিছু ক্ষেত্রে নীরবতাও প্রতিবাদের উপাদান হয়ে উঠেছে। বক্তব্য ও নীরবতাকে প্রায়শই বিপরীত অবস্থানে দেখা হয়। কারণ, একটি পরিস্থিতি তৈরি হয় ভাষা ও বক্তব্যের অনুপস্থিতি বা উপস্থিতির উপর নির্ভর করে। এ প্রসঙ্গে নিম্নবর্গের ইতিহাস সমালোচক ও প্রাবন্ধিক শাইল মায়ারাম তাঁর ‘Speech, Silence and the making of partition violence in Mewat’ প্রবন্ধে বক্তব্য ও নীরবতার মধ্যে সম্পর্ক প্রসঙ্গে জানিয়েছেন,

> ‘At one level, there is an obvious association between both speech and silience and the construction of truth. Speech is generally viewed as the other of silence, the absence of voice. Paradoxically, as we shall see, both language and speech do not preclude silence.’ (Amin 1996, p. 127)

অর্থাৎ এক স্তরে বক্তব্য এবং নীরবতা উভয়ের মধ্যেই একটি সুস্পষ্ট সম্পর্ক আছে। বক্তব্য সাধারণত দেখা হয় নীরবতার অন্য দিক হিসেবে। নীরবতা হল কণ্ঠস্বরের অনুপস্থিতি। বিপরীতভাবে আমরা দেখতে পাব, ভাষা এবং বক্তব্য উভয়ই নীরবতাকে বাধা দেয় না। নীরবতা সম্পর্কে এই বক্তব্যকে স্মরণে রেখে

আমরা হরিশংকরের ‘প্রতিশোধ’ গল্পের মাধুরী ও ‘প্রস্থানের আগে’ উপন্যাসের ফাল্গুনী নারী চরিত্র দুটির নীরব প্রতিবাদকে লক্ষ করেছি। দুটি ক্ষেত্রেই ঘটনার সাজুয্য রয়েছে।

এক. দু'জনকেই বাড়ি থেকে সুযোগ্য পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দুই. দুজনেই পিতার আদরের সন্তান।

তিন. দুজনের ক্ষেত্রেই বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের অমতে কেবল পিতার পছন্দের ওপর নির্ভর করে বিয়ে দেওয়া হয়েছে।

চার. দুজনের ক্ষেত্রেই পরবর্তীকালে স্বামীর নেশাগ্রস্ততা ও জোচ্চোরগিরি ধরা পড়েছে।

প্রথমত 'প্রতিশোধ' গল্পে দেখি, যে সোমেশ্বর একদিন মেয়েকে শিক্ষিত করবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছিল, সে-ই একদিন মাধুরীকে হঠাৎ বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। সোমেশ্বর ভেবেছিল বিয়ে দিলেই বোধ হয় মাধুরীর জীবন নিরাপত্তা ও সুখে শান্তিতে ভরে উঠবে। কিন্তু মিতভাষী মাধুরী এই সিদ্ধান্ত মন থেকে মানতে পারেনি বলে তার বাবাকে বলেছিল-

> ‘বাবা, আমার তো বিয়ার বয়স হয় নাই। তুমি আমাকে পড়াবে বলছিলা।এখন বিয়া দিতে চাও কেন? এখন বিয়া দিও না বাবা আমারে।’ (জলদাস ২০১৬ (ক) পৃ. ৮৩)

আদরের মেয়ের অনুরোধ-আবদার অগ্রাহ্য করেই কর্ণফুলীর পূর্বপাড়ে চৌকিদারের পুত্র বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে মাধুরীর বিয়ে ঠিক করেছিল সোমেশ্বর। কারণ পাত্র শিক্ষিত ও জার্মান কোম্পানিতে ক্লার্কের চাকরি করে। শিক্ষিত ছেলে পেয়ে সোমেশ্বর মনে মনে শান্তি পেয়েছিল। বিয়ের পর বেশ কয়েকবার মাধুরী বাপের বাড়ি এলে অন্যান্য সদস্যরা মাধুরী চোখেমুখে অশান্তির ছোঁয়া অনুভব করে। কিন্তু তাকে জিজ্ঞেস করলে মাধুরী এড়িয়ে যায়।

> ‘মাধুরী ম্লান হাসে। মুখে কোনো জবাব দেয় না। (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ৮৫)

কিন্তু ঘটনাক্রমে সোমেশ্বরের এক দুঃসম্পর্কের দিদি যার জলধিতে বিয়ে হয়েছিল তার বাড়িতে ঘুরতে এসে সোমেশ্বর জানতে পারে-

> ‘মেয়েটাকে যে বিয়া দিলা আমাদের একটু জিজ্ঞাসা করল না। সুলুক সন্ধান না করে ধুম করে মাইয়াটারে এক জুয়াড়ির সঙ্গে বিয়া দিলা!’ (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ.৮৭)

সোমেশ্বরের দিদির দেওয়া বর্ণনা অনুযায়ী বিচিত্রবীর্য ছেলেবেলা থেকে জুয়াড়ি। কম বয়স থেকে মদের নেশা ধরে ছিল সে। তাছাড়া দুশ্চরিত্র চিটিংবাজ বিচিত্রবীর্যের সংসারে কোনো মন নেই। চৌকিদার ভেবেছিল বিয়ে দিলে ছেলে ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু চাকরি থেকে ফিরেই সে জুয়ার আসরে বসে। দিদির মুখে একথা শুনে সোমেশ্বর হতবাক হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে তার অপরাধ।

> 'আমি বুঝেছি, মাধুরীর অভিমান আমার উপর। আমি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়া দিছি। সে আমার উপর প্রতিশোধ নিছে।' (জলদাস ২০১৬(ক), পৃ. ৮৮)

যে কন্যা পিতা অন্তপ্রাণ তার ইচ্ছের সম্মান রাখতেই মাধুরী এই অনিচ্ছাকৃত বিয়েতে রাজি হয়েছে। বাড়ির সদস্যরা চেয়েছিল মাধুরী সুখে থাক। তাইতো স্বামীর চরিত্রের কথা হাসি মুখে চেপে গিয়েছে সে। শারীরিক ও মানসিক অসুখ চেপে রেখে সুখের অভিনয় করার মধ্য দিয়েই পিতার হঠকারী সিদ্ধান্তের নীরব প্রতিবাদ করে গিয়েছে মাধুরী। তাইতো হঠাৎ একদিন সোমেশ্বরের কাছে খবর আসে মাধুরীর মারাত্মক রোগ হয়েছে। পিতা মাধুরীকে নিয়ে আসার জন্য জোরাজুরি করলেও সে সংসারের দোহাই দিয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে গিয়েছে। কিন্তু দুদিন পর খবর এসেছে মাধুরী গত রাতে মারা গিয়েছে।

তাহলে দেখা গেল, মাধুরীর ইচ্ছের বিরুদ্ধে তার সুখের ব্যবস্থা করা পিতার হঠকারী সিদ্ধান্ত তার জীবনে কী বিপুল দুঃখ-কষ্ট বয়ে এনেছে। শিক্ষিত হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়ে হঠাৎই তাকে অন্য জগতে পাঠিয়ে দেওয়ার ঘটনাটি মাধুরী মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু পিতার উপর অভিমান করা ছাড়া তার করণীয় তো কিছুই নেই। ফলে নীরব থাকার মধ্যে দিয়েই অভিমান ও দুঃখ-কষ্টকে লাঘব করতে চেয়েছে সে। যা একইসঙ্গে হয়ে উঠেছে প্রতিবাদের নামান্তর।

আবার 'প্রস্থানের আগে' উপন্যাসেও 'প্রতিশোধ' গল্পের পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা গিয়েছে। মাধুরীর মতো ফাল্গুনীর নীরবতার কারণ সুশীলা বুঝতে পারে।

> 'সুশীলা পিসি বলে, 'হয়তো তোমার ওপর বা তোমার সমস্ত পরিবারের ওপর হের বড়ো অভিমান আছে। হয়তো তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে হেরে তোমরা এই ঘরে বিয়া দিছ। হয়তো সে প্রতিশোধ লইতাছে তোমার উপর। নিজে তিল তিল কইরে মইরে যাবে, তবুও নিজের বেদনার কথা কইবে না তোমারে—ইটাই বোধহয় পণ কইরেছে ফাল্গুনী।'
>
> (জলদাস ২০১৯, পৃ. ১৭৯)

সুশীলা পিসির কাছে যেটা 'হয়তো' বা 'বোধহয়' বলে প্রতিপন্ন হয়েছে, পিতা সুধাংশুর কাছে সেটাই নিশ্চিত রূপে সত্য বলে প্রমাণিত। কারণ সুধাংশু জানে সে বাড়ির সদস্যদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ফাল্গুনীর বিয়েটা দিয়েছিল। তাই ফাল্গুনীর নীরবতা একটা সময় সুধাংশু কাছে তার কৃতকর্মের অনুশোচনা ও অপরাধবোধে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। তাইতো কন্যার কাছে পিতার আকুল প্রার্থনা-

> 'আমারে মাফ কইরে দে রে ফাল্গুনী, আমারে ক্ষমা কইরে দে।' (জলদাস ২০১৯, পৃ. ১৮০)

অন্যদিকে 'কসবি' উপন্যাসের ইলোরা নামক পতিতা চরিত্রের নীরব প্রতিবাদের কথা বলতে হয়। আলোচ্য উপন্যাসে জানা যায়, ইলোরা চাকমার আসল নাম উমা প্রু চাকমা। রাঙামাটির প্রত্যন্ত অঞ্চলের এক গ্রামের মেয়ে সে। এক বাঙালিবাবুর প্রেমে পড়ে তার হাত ধরে বাড়ি থেকে পালিয়েছিল

সে। শারীরিক শোষণ করে সে বাবুটি তাকে এই সাহেবপাড়ায় বিক্রি করে দিয়ে গিয়েছে। প্রেমিকের বিশ্বাসঘতকতা, মা-বাবাকে ত্যাগ করার অপরাধবোধ ও মাসি-কাস্টমারের দৈহিক নির্যাতন তাকে নির্বাক করে তুলেছে। তার মনে এখন শুধুই পুরুষজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ। তাইতো তার সিফিলিস রোগ হলেও সে ইচ্ছে করেই নীরব থেকে এই রোগের চিকিৎসা করাতে চায়নি। কারণ ইলোরা জানে এই রোগ সহবাসের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পুরুষ যৌনাঙ্গে জ্বালা-যন্ত্রণার সৃষ্টি করবে। পুরুষটি চাইলেও এই যন্ত্রণা বা পতিতাগমনের কথা সকলকে বলতে পারবে না। এই দৃশ্য কল্পনা করেই ইলোরা সুখ অনুভব করে। উপন্যাসে তার মনের নীরব প্রতিশোধের কথা শোনা গিয়েছে,

> ‘সহবাসকালে সে ক্ষতস্থানে, একটু একটু ব্যথা পাচ্ছে বটে, কিন্তু প্রতিশোধস্পৃহার কাছে তার এই ব্যথা কিছুই নয়। সে এই রোগ সারাবে না, যাবে না জীবন ডাক্তারের কাছে। সে অপেক্ষা করে আছে একজনের জন্যে।...
>
> যেদিন বাঙ্গালিবাবুর শরীরে সিফিলিসের জীবাণু ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হবে, শুধু সেইদিনেই যাবে জীবন ডাক্তারের কাছে। তার আগে নয়। কিছুতেই নয়, কিছুতেই নয়।’ (জলদাস ২০১১, পৃ. ৭৬-৭)

তাহলে দেখা গেল, একজন নারী তার প্রাণের ঝুঁকি নিয়েও শুধুমাত্র প্রতিশোধকে সফল করার উদ্দেশ্যে তার মারাত্মক রোগ সম্পর্কে নীরব থেকেছে। ইলোরার এই নীরব প্রতিবাদ আসলে সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গীয় নারীর স্বতন্ত্র চেতনাকেই প্রমাণ করে।

সুতরাং এ পর্যন্ত আলোচনায় নিম্নবর্গীয় নারীর প্রতিবাদ-প্রতিরোধের যে ধরন উঠে এল তা আসলে নিম্নবর্গের সমগ্র সমাজের হয়ে কথা না বলতে পারার ফল। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক আসলে ‘Can the subaltern speak?’ প্রশ্নের মধ্য দিয়ে একথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে নিম্নবর্গের কেউ কথা বলার জন্য মৃত্যু বা আত্মহত্যার চেষ্টা পর্যন্ত করে, নীরব থেকে প্রতিবাদ করে, আবার প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিরোধও করে। কিন্তু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নবর্গীয় নারী শোনা ও বলার মাধ্যমে তাদের বক্তব্যকে সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপন করতে পারে না। আর পারে না বলেই উচ্চবর্গের কাছে নিম্নবর্গের বক্তব্য পৌঁছায় না। তারা ধীরে ধীরে তথাকথিত ক্ষমতাবান তথা এলিট শ্রেণির কাছে ‘কিছুই নয়’ অর্থাৎ অস্তিত্বহীন হিসেবে বিবেচিত হয়। ডোনা ল্যান্ডরি ও গেরাল্ড ম্যাকলেন-এর দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে গায়ত্রী চক্রবর্তীর স্পিভাক তা স্পষ্ট জানান-

> ‘... “the subaltern can not speak”, means that even when the subaltern marks an effort to the death to speak, she is not able to be heard, and speaking and hearing complete the speach act. That’s what it had meant, and anguish Marked the spot.’ (Morris (ed.) 2010, p.292)

স্পিভাক আরো বলেন যে যদি কেউ ‘speak’ শব্দটিকে সাহিত্যিক অর্থে ‘Talk’ হিসেবে গ্রহণ করেন তাহলে তার ভুল ব্যাখ্যা করা হবে কারণ ‘speak’ ও ‘Talk’ শব্দটির অর্থ এক হলেও এর ব্যবহারে

ভিন্নতা রয়েছে। 'Speak'-এর ব্যবহার হয় বক্তার কণ্ঠে শব্দ উৎপাদনের ওপর আলোকপাত করে, কিন্তু 'Talk' শব্দটি একে অপরের সঙ্গে কথাবার্তা বলার অংশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। (Landry (eds.) 2012, p. 291) সুতরাং নিম্নবর্গের কথা বলতে না পারার অর্থ তারা নিজস্ব চেতনার ভাববস্তুকে নিজ কণ্ঠস্বরে শব্দ উৎপাদনের মধ্যে প্রকাশ করতে পারে না। তাই বাধ্য হয়ে তারা প্রতিবাদ-প্রতিরোধের নানা বিকল্প পথ খুঁজে নেয়। নিম্নবর্গীয় নারীদের ক্ষেত্রে আমরা তাই প্রতিবাদের বিভিন্ন ধরনকে উপলব্ধি করলেও তাদের নিজস্বতাকে তেমনভাবে প্রকটিত হতে দেখিনি। নারীর যতটুকু প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায় তা কেবল সাময়িক ক্ষেত্রে অন্যায়কারীকে অস্বস্তিতে ফেলেছে ঠিকই কিন্তু তথাকথিত আধিপত্যকামী নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্য আরেকটি পথ অবলম্বন করেছে। তাই নিম্নবর্গ যতবারই প্রতিবাদ করেছে, সেই প্রতিবাদের উদ্দেশ্য প্রতিবারই বিফলতায় পর্যবসিত হয়েছে। নিম্নবর্গীয় চেতনার বৈশিষ্ট্য হিসেবে কথা বলতে না পারার বিষয়টি তাই প্রতিবাদের বিফলতার মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যা আমরা পরবর্তী পরিচ্ছেদে বিশদে আলোচনা করব।

৫.৪ নিম্নবর্গের নিষ্ক্রিয়তা ও প্রতিবাদহীনতা

কথাবিশ্বে প্রতিবাদ-প্রতিরোধী সত্তাটি যেমন নিম্নবর্গীয় চেতনার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবে আমরা পেয়েছি তেমনই পরিস্থিতি অনুযায়ী কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রতিবাদহীনতাও নিম্নবর্গীয় চেতনারই একটি বৈশিষ্ট্য রূপে উঠে এসেছে।

'জলপুত্র' উপন্যাসে কামিনী বহদ্দার চরিত্রটিকে আমরা অন্যায় বঞ্চনা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়, প্রতিবাদহীনতার ভূমিকায় লক্ষ করেছি। উপন্যাসে কামিনী মাছ মারার মরশুমে শুক্কুরের কাছ থেকে ধার নেয় এই শর্তে যে, যত মাছ ধরা পড়বে তার সবই তার কাছে বিক্রি করতে হবে। কিন্তু কামিনী বহদ্দারের জালে লম্বু ধরা পড়লে সেই মাছ শুক্কুর জলের দামে কিনতে চায়। কামিনী তাতে রাজি না হলে শুক্কুর তাকে চড় মারে। লক্ষণীয় চড় মারার পরও শুক্কুর তাকে গালমন্দ করতে থাকে ও মাছ তার দামেই বিক্রি করার হুমকি দেয়। কিন্তু কামিনী বহদ্দার এর তরফ থেকে কোনো জোরদার প্রতিক্রিয়া বা প্রতিবাদ লক্ষ করা যায় না। মার ও গালাগাল খাওয়ার পর তার বক্তব্য শুধু এতটুকুই-

> "মাছ তো তোঁয়ার কাছে বাজার দামে বেচনর কথা, তুঁই তো তোঁয়ার ইচ্ছা মতন দাম দিতা চাইতা লাইগ্য।' শরীর থেকে বালি ঝাড়তে ঝাড়তে কাঁদো কাঁদো স্বরে কথাগুলো বলল কামিনী।" (জলদাস ২০০৮, পৃ. ৫২)

'কাঁদো কাঁদো স্বরে' কথা বলার মধ্যে ভীরুতা ও নিষ্ক্রিয়তা প্রদর্শিত হয়। কামিনীর যেখানে অন্তত মৌখিক প্রতিক্রিয়া করার কথা সেখানে ঘটনাস্থলে উপস্থিত বিজন বহদ্দার ও রামনারায়ণ বহদ্দার কামিনীর হয়ে শুক্কুরের অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে। শুধু তাই নয়, গঙ্গার নেতৃত্বে জেলেজীবনের ধারায় যে দিক-পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে তাতে সকলের সমান উত্তেজনা ও সচেতনতা থাকলেও কামিনী বহদ্দারের নিষ্ক্রিয়তা লক্ষণীয়। অনিল যখন উত্তেজিত কণ্ঠে কামিনীর উদ্দেশ্যে বলে-

> 'আর কত মাইর খাইবা? জীবন বাজি রাখি যে-মাছ ধরি আন, হেই মাছ আর কতদিন বিনা পয়সায় বিলাই দিবা?'
>
> (জলদাস ২০০৮, পৃ. ১০৮)

এর উত্তরে কামিনী বহদ্দার এর প্রতিক্রিয়া প্রণিধানযোগ্য। উত্তেজনাহীন প্রতিবাদহীন ভাবে সে অদৃষ্টের হাতে সব ছেড়ে দিয়ে বলে-

> 'কী গইয্যম? আঁরার কোয়ালত্ লেখা আছিল। কেএন গরি খন্ডায়ম?' (জলদাস ২০০৮, পৃ. ১০৮)

ধর্মের দোহাই দিয়ে কর্ম থেকে পিছিয়ে যাওয়ার অর্থ হল অক্ষমতা ও ভীরুতা। নিম্নবর্গের ইতিহাসে আলোচিত নিম্নবর্গীয় চেতনার এটি একটি লক্ষণ। রণজিৎ গুহ যাকে নিম্নবর্গীয় চেতনার ধর্মভাব বলেছেন। যদিও এই ধর্মাভাব বলতে শুধু ধর্ম বা ধর্মসংস্থার প্রতি আনুগত্য বোঝায় না, তা আসলে চেতনার সেই অবস্থা-

> 'যার প্রভাবে জীব জগতের কোনো সত্তাকে বাস্তবের ভাবনার অন্তর্গত কোনো বিষয়কে তা যথার্থভাবে ধারণার মধ্যে আসতে পারে না, এবং এক বিষয়ের উপর আরেক বিষয়ের গুণ আরোপ করে। ফলে যা ঐহিক তাকে অলৌকিক বলে মনে হয় যা একান্তই মানবিক তাকে দৈব বলে ভুল হয়।' (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ. ৪৩)

অর্থাৎ এই ধর্মভাবের ফলে কর্তা কখনো কখনো নিজের কৃতকর্মকে সঠিকভাবে চিনতে পারে না। যা তার নিজের কৃতিত্ব তাকে সে অন্যের প্রতিবাদ বা কৃতিত্ব বলে বর্ণনা করে। তাইতো আলোচ্য উপন্যাসে গঙ্গাপদ জেলেদের অধিকারবোধে সচেতন করে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার প্রস্তুতি নিলে কামিনী বহদ্দারের সঙ্গে অন্যায় বঞ্চনাকে শুক্কুর শশিভূষণের বদলে কপাল বা ভাগ্য বলে মেনে নিয়েছে। সুতরাং কামিনীর সমমর্যাদায় বসবাসকারী জেলেদের মধ্যে প্রতিবাদী চেতনা জাগরিত হলেও কামিনী বরাবর নিষ্ক্রিয়তা ও ভীরুতার পরিচয় দিয়েছে।

যদিও 'সাবঅলটার্ন স্টাডিজ' বর্ণিত কৃষক বিদ্রোহের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে তৎকালীন ঔপনিবেশিক যুগের বাস্তব অভিজ্ঞতা যে একেবারে অবিকল মিলে যাবে এমন নয়। আমরা যে কৃষক চৈতন্যের উপর নির্ভর করে তথাকথিত নিম্নবর্গের চেতনার বৈশিষ্ট্যকে অনুধাবন করেছি তা শুধুমাত্র তাত্ত্বিক প্রস্তাবের মূলসূত্র। স্থান, কাল, পাত্র ও পরিস্থিতিভেদে চেতনার বৈশিষ্ট্যগুলি তাদের সাধারণ চরিত্র

অক্ষুন্ন রেখেই এক এক পরিস্থিতিতে এক একভাবে উঠে আসে। তাইতো 'দহনকাল' উপন্যাসে রাধানাথকে একজন প্রতিবাদী চরিত্র হিসেবে দেখা গেলেও বাস্তবতার সঙ্গে সেও আপোষ করে নিষ্ক্রিয়তার পরিচয় দিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, রাধানাথের যখন নিজস্ব নৌকা ছিল না তখন সে অনেক অনুরোধ করে রমণীমোহন বহদ্দারের নৌকায় পাউন্যা হিসেবে কাজ করার সুযোগ পায়। কিন্তু রমণীমোহন রাধানাথের অসহায়তার সুযোগ নেয়। দেখা যায়, জেলে সমাজের অলজ্ঘনীয় শর্ত হিসেবে বহদ্দারের তিনটি ও পাউন্যার একটি জালের মধ্যে বহদ্দার একটি দেয়াল থেকে মাছ তোলার পর পাউন্যা নাইয়ার জাল থেকে মাছ তুলতে হবে। কিন্তু রাধানাথের ক্ষেত্রে এই শর্ত লজ্ঘন করেছে রমণীমোহন। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া বা প্রতিবাদ করেনি রাধানাথ।কারণ তার মনে বহদ্দার হওয়ার স্বপ্ন-

> 'আর রাধানাথ জানে—বহদ্দার হতে চাইলে এইসব ছোটোখাটো অনৈতিক অসম ব্যাপারকে উপেক্ষা করতে হবে। রাধানাথ করেছেও তা-ই। (জলদাস ২০১০, পৃ. ১৮)

আমরা জানি কিছু পেতে হলে কিছু হারাতে হয়। রাধানাথও বহদ্দারের মর্যাদা পেতে রামনীমোহনের অনৈতিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় থেকেছে। যদিও একটা সময় পর রাধানাথ রমণীমোহনকে ছেড়ে অন্নচরণ বহদ্দাররের নৌকায় পাউন্যা হিসেবে কাজ নেয়। কিন্তু সেক্ষেত্রেও অন্নচরণ অলজ্ঘনীয় শর্ত লংঘন করেছে। তাই দেখা যায়, অন্নচরণ নৌকা ভর্তি মাছ নিয়ে ঘরে ফেরে আর রাধানাথ ফেরে শূন্য হাতে। তারপরও কোনো প্রতিবাদ করতে পারে না রাধানাথ। শুধু রাধানাথ নয়, তার মতো অন্য অনেক পাউন্যাই বহদ্দারের এই অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করে। তাই বলে এই নয় যে, প্রতিবাদের ভাষা বা ধরন তাদের জানা নেই। আসলে তারা জানে প্রতিবাদ করলেই শাস্তি স্বরূপ বহদ্দারের অসহযোগিতা নেমে আসবে তাদের ওপর। গোঁজ পোতার সময় বহদ্দাররা যদি তাদের নৌকা দিয়ে সাহায্য না করে—এই ভয়ে তারা প্রতিবাদহীন নিষ্ক্রিয় দিন কাটায়। উপন্যাসে জানতে পারি-

> 'একজন বহদ্দারের অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে সব বহদ্দারের অসহযোগিতা তাদের মাৎস্যজীবনকে জেরবার করে ছাড়ে।' (জলদাস ২০১০, পৃ. ৩৪)

অর্থাৎ বহদ্দার তার নিজস্ব নৌকা থাকার ক্ষমতার অপব্যবহার করে পাউন্যা ও অন্যান্য জেলেদের প্রতি আধিপত্য বিস্তার করে। কিন্তু অধীন জেলেরা অন্য কোনো সাধারণ জেলের সহযোগিতা পর্যন্ত পায় না। প্রতিরোধ গড়ে তোলার সম্ভাবনা থাকে না সেখানে। ফলে নিরুপায় পাউন্যা নাইয়ারা নিষ্ক্রিয় ও অসহায় বোধে 'দৈনন্দিন অধীনতার অভিজ্ঞতা' নিয়ে জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়।

অন্যদিকে রাধানাথের মা চন্দ্রকলা হাটে মাছ বিক্রি করাকালীন কোনো এক জনৈক ভদ্রলোক দ্বারা প্রতারিত হন। কারণ টাকা খুচরো নেই বলে ক্রেতা মাছের দাম না দিয়ে চলে গিয়েছে। চন্দ্রকলা

সেই ভদ্রলোকের জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করলেও সে ফেরেনি। নিরুপায়, অসহায় চন্দ্রকলা দুঃখ প্রকাশ করে বলেন,

> ‘চল যাই, ভগমান তুঁই তার বিচার গর। আঁর পোয়ার দইজ্যা-হেঁচা মাছ।’ (জলদাস ২০১০, পৃ.৪৩)

বাড়িতে ফিরে সেই ক্রেতার বঞ্চনার কথা ভুলতে পারে না চন্দ্রকলা। আবার রাধানাথকেও এই বঞ্চনার কথা বলতে পারে না। কারণ রাধানাথের উত্তরও তার জানা,

> ‘দাম নো দি মাছ লই গেইয়ে গই বুলি তুঁই মন খরাপ নো গইয্যো মা। হিতার কোয়ালত্ লেখা আছিল মাছ হিউন।’
> (জলদাস ২০১০, পৃ. ৪৪)

এক্ষেত্রে ‘জলপুত্র’ উপন্যাসের কামিনীর মত চন্দ্রকলা ও রাধানাথ নিজের কৃতকর্মের বিষয়ের ওপর ঈশ্বর ও অদৃষ্টের গুণ আরোপ করেছে।

আবার রাধানাথ যখন তিন টাকার বেশি দামের একটি ইলিশ মাছ বেচার জন্য হাটে নিয়ে যাচ্ছে তখন আব্দুল খালেক মেম্বার ইলিশ মাছটি একপ্রকার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়,

> ‘তারপরও তিন টিয়া হাতত্ গুঁজি দি মেম্বরে কইলো—ল ল। আঁরা তো চাইলে উগ্গা-দুউয়া মাছ মক্তো পাই। তিন টিয়া দিদ্দে বউত্। লেজত্ ধরি লটকাই লই হাঁডা দিল। কী কইতে পারি? মেম্বর রাইতরে দিন গরে।’
> (জলদাস ২০১০, পৃ. ৪৪)

‘কী কইতে পারি?’- এই অসহায়তা প্রকাশের মধ্যে যে রাধানাথের মনে এক ধরনের ভীরুতা ও অক্ষমতা কাজ করেছে তা আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয়নি। কারণ আব্দুল খালেক মেম্বার সমাজের তথাকথিত ক্ষমতাবানদের একজন। তার অনুগত না হয়ে থাকলে রাধানাথের সমূহ ক্ষতি হওয়ার ভীতি রাধানাথকে প্রতিবাদহীন ও নিষ্ক্রিয় করে তুলেছে।

একই প্রসঙ্গে উঠে এসেছে ‘অর্ক’ উপন্যাসে। বলরামের মত সাধারণ জেলেদের কাছ থেকে ছোবান মেম্বারের মতো মানুষেরা মাছ নিয়ে দাম দেয় না। কারণ জেলেদের জন্য সরকারি রিলিফ আসে তার কাছে। সব জেলেদের জন্য বরাদ্দ টাকাকে নিজের কৃতিত্ব বলে আদায় করে সে। সেই সুযোগে জেলেদের কাছ থেকে বিনামূল্যে মাছ নেয়। কেউ দাম চাইলে রিলিফ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেয়। ফলে সকলে প্রতিবাদহীন হয়ে মেম্বারের হাতে শোষিত হয়। কিন্তু দিবাকরকে হাইস্কুলে ভর্তি করার প্রসঙ্গে প্রধান শিক্ষক সত্যব্রত চক্রবর্তী বলরাম ওদের মত অসহায় মানুষদের উজ্জীবিত করার জন্য সমাজ বাস্তবতাকে তার সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেন।

> ‘দেখ বলরাম, যুগ যুগ ধরে তোমরা তুই-তোকারি, গালিগালাজ শুনে আসছ। তোমাদের কাছ থেকে ভালো আর বড়ো মাছগুলো ছলেবলে হাতিয়ে নিচ্ছে ওরা। তোমরা এসব অন্যায়কে ঈশ্বরের বিধান বলে সহ্য করে আসছ। এসব ঈশ্বরের বিধানটিধান কিচ্ছু না। এর জন্য দায়ী তোমাদের প্রতিবাদহীনতা।’ (জলদাস ২০১৭, পৃ. ২২)

আমরা লক্ষ করলাম সত্যব্রত বাবুর বক্তব্যে তথাকথিত নিম্নবর্গীয় চেতনার বৈশিষ্ট্যগুলি স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে। এখানে একই সঙ্গে নিম্নবর্গের অধীনতার চেতনা, ধর্মভাবের লক্ষণ ও প্রতিবাদহীন উপাদানের কথা উঠে এসেছে। যা এ পর্যন্ত আলোচনায় আমরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি। নিম্নবর্গীয় চেতনা সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গি শুধু সত্যব্রত চক্রবর্তী নয়, এই দৃষ্টিভঙ্গি বলরামের মত সাধারণ জেলে তথা নিম্নবর্গের ভাবনাতেও ধরা পড়েছে। তাই তো সে মনে মনে উপলব্ধি করে-

> ‘সত্যি তো, বংশানুক্রমে এতটি বছর তারা মুখ বুজে হিন্দু-মুসলমানের অপমান লাঞ্ছনা সহ্য করে এসেছে। কথায় কথায় জাইল্যা-ডোম বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছে। ঘরে আসন পেতে বসতে দেয়নি কোনোদিন। নৌকা থেকে পাঙাশ মাছটি, ইলিশ মাছটি, কোরাল মাছটি হাতে ধরে নিয়ে গেছে, দাম চাইবার সাহস করেনি। কখনো বা দাম চাইলে ছাতার বাট দিয়ে মাথায়-গায়ে বাড়ি মেরেছে। এসব অত্যাচারের কোনোই তো প্রতিবাদ করেনি তারা। প্রতিবাদ করার কথা মনেই আসেনি কোনোদিন।’ (জলদাস ২০১৭, পৃ. ২৩)

সমস্ত অন্যায়-বঞ্চনাকে মুখ বুঝে সহ্য করে আসার মধ্যে যেমন প্রতিবাদহীনতা ধরা পড়েছে তেমনই প্রতিবাদ করার কথা মনে না আসার মধ্যে ভীরুতা, নিষ্ক্রিয়তা ও আনুগত্যের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে নিম্নবর্গীয় চেতনায়। শুধু তাই নয়, ছোবান মেম্বারের অন্যায়-অত্যাচারের উদাহরণ হিসেবে আমরা যখন দেখলাম রহমালির রিক্সায় তিন মাইল পথ এসে তাকে পাঁচ টাকার দিলে সে সাত টাকা দাবি করলে ছোবান মেম্বার তাকে মাটিতে ফেলে জুতো দিয়ে বেধড়ক মারলেন।

> ‘হয়রান না হওয়া পর্যন্ত রহমালিকে পিটিয়ে গেলেন ছোবান মেম্বার। আশেপাশের লোকেরা নির্বাক দর্শক হয়ে থাকল। কেউ প্রতিবাদ করার সাহস করল না।’ (জলদাস ২০১৭, পৃ. ১০৯)

ইতিপূর্বে জেনেছি ‘প্রতিবাদ করার সাহস’ সঞ্চিত হয় তখনই যখন নিম্নবর্গের আগ্রহ ও সমস্যাগুলি একি বলে প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু রহমালি সাধারণ রিক্সাচালক, তার প্রহৃত হওয়ার ও বেদনা তার নিজেরই। সুতরাং রহমালি মতো শোষিত ও নিপীড়িত হতে নির্বাক দর্শকের মধ্যে কেউ চায়নি। ফলে তাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চারিত হয়ে তারা প্রতিবাদী নিষ্ক্রিয় থেকেছে।

আবার ‘কসবি’ উপন্যাসে সাহেবপাড়া পতিতাপল্লীর কালিমাতার মন্দিরে পুরোহিত চরিত্রটি কালু সর্দারর দাপটে একটা সময় পর্যন্ত নিষ্ক্রিয় প্রতিবাদহীন হয়ে থেকেছে। উপন্যাস অনুযায়ী মন্দিরের পেছনে একচালা ঘরটি কালু সর্দারের অন্যায় অপকর্মের আঁতুড়ঘর। কারণ সেই ঘরটি অপরাধী, খুনি, গুন্ডাদের

আশ্রয় কেন্দ্র। খুনের আসামি, জেলপলাতকদের কালু ঘরটিতে টাকার বিনিময়ে আশ্রয় দেয়। কালুর দুষ্কর্মের কথা অন্য কেউ না জানলেও মন্দিরের পুরোহিত জানেন। কিন্তু কালুর বিরুদ্ধে গিয়ে এই সত্য উন্মোচনের সাহস নেই পুরোহিতের। কারণ তিনি জানেন এর ফলস্বরূপ কালুর ক্ষোভের মুখে পড়তে হবে তাকে। উপন্যাসের বর্ণনায়,

> ‘সর্দারের এই দুষ্কর্মের কথা অন্য কেউ না জানলেও মন্দিরের পুরোহিত জানেন। কিন্তু বলার সাহস পুরোহিতের নেই। তাঁর ঘাড়ে কটি মাথা আছে যে, তিনি সর্দারের দুষ্কর্মের প্রতিবাদ করবেন?’ (জলদাস ২০১১, পৃ. ৯৫)

অন্যদিকে ‘একলব্য’ উপন্যাসের ঘটনা অনুযায়ী দেখা যায় যে গুরু দ্রোণ দ্বারা একলব্যকে নিষাদ পুত্র বলে যখন অস্ত্র শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা হয় তখন হতবাক একলব্য মনে গভীর অপমান বোধ নিয়ে অরণ্যে প্রবেশ করে। সেখানে সে দৃঢ় সংকল্প বসে দ্রোণের মাটির মূর্তি নির্মাণ করে তার সামনে কঠোর অধ্যবসায়ে অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ হয়ে ওঠে। একজন নিম্নবর্গের উত্থানকে স্তিমিত করে দেওয়ার জন্য দ্রোণাচার্য কূটকৌশলে গুরুদক্ষিণা স্বরূপ অস্ত্র চালনার জন্য অত্যাবশ্যকীয় প্রত্যঙ্গ বুড়ো আঙ্গুল একলব্যর কাছ থেকে কেড়ে নেন। দ্রোণাচার্যের এই গর্হিত অন্যায়ের বিরুদ্ধে একলব্য কোনো প্রতিবাদ করেনি, করতে পারেনি। কারণ গুরুর কাছে তার আত্মা সমর্পিত। এই সমর্পণের সুযোগ নিয়ে গুরু তার শিষ্যের সর্বনাশ করতে চেয়েছেন। মহাবীর কর্ণ এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে নিজের কাছে প্রশ্ন করতে বাধ্য হয়েছেন।

> ‘এ কেমন মানুষ রে বাবা! এত বড়ো অন্যায় কাজের পর, নিজের মূল্যবান অঙ্গ হারানোর পর, নিদারুণ লাঞ্ছনার পরও কোনো ভাবান্তর নেই! রোষে জ্বলে ওঠা নেই, কান্নায় ভেঙে পড়া নেই, উন্মাদের মতো আচরণ নেই, শুধু ধীরস্থির হয়ে থাকা। এ কেমন নিষাদ! নিষাদদের কি জ্বালাযন্ত্রণা নেই? তারা কি বেদনায় কাঁদে না? তারা কি অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শিখে নি?’ (জলদাস ২০১৬, পৃ. ১৫০)

যদিও এক্ষেত্রে একলব্যের প্রতিবাদহীনতার কারণ ভীরুতা নয়। শাস্তির ভয়ে নয়, তার নিষ্ক্রিয়তার কারণ গুরুর প্রতি অচলভক্তি ও সমর্পণ। একলব্যের আচরণে এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে কেবল ধর্মভাব বা ভীরুতার কারণে প্রতিবাদহীন থাকে না নিম্নবর্গ। কখনো কখনো নিজ আত্মমর্যাদা ও মহত্ত্ব প্রদর্শনেও নিম্নবর্গ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

‘সুখলতা ঘর নেই’ উপন্যাস লক্ষ করা যায় যে, মৎস্যসমাজে ছোটো জাত বলে পরিচিত চেরবডি জাতের এক দরিদ্র মৎস্যপরিবারের মেয়ে একদিন পঞ্চানন সর্দারের ছেলে জগয়াইয়ের চোখে পড়ে। সে তাকে বাড়িতে দাসী হিসেবে আশ্রয় দেয়। কিন্তু আশ্রয় ও খাদ্যের বিনিময় সে মেয়েটিকে জগাইয়ের শারীরিক ক্ষুধা মেটাতে হয়।

> 'যেন বহুবার বহু ভাবে লাঞ্ছিত হতে হতে নারীত্বের সকল সম্ভ্রমবোধের কথা সে ভুলে গেছে।'
>
> (জলদাস ২০১৯(খ), পৃ. ১২০)

দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে একজন নারীর শরীর উপভোগ করার মধ্যে ক্ষমতার আস্ফালন প্রকাশ পেয়েছে। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে সেই নারীর তরফ থেকে কোনো প্রতিবাদী চেতনা জাগরিত হয়নি বরং একজন নারী হয়ে আরেকজন নারীর সুখলতার কাছে তার মনোবেদনা প্রকাশ করেছে মাত্র। জগাই দ্বারা শারীরিকভাবে শোষিত হয়েও সে নিষ্ক্রিয় থেকেছে কারণ সে জলতলের সমাজে ছোটো জাত বলে বিবেচিত। দৈহিক আকারেও তারা ছোটো,বলও সীমিত। তাই তারা সাগরের সব ধরনের মাছের অবহেলার শিকার। সুতরাং যে শ্রেণি সমাজের অন্যান্য সকল শ্রেণির কাছে অবহেলিত তারা কার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলবে। তারা নিম্নশ্রেণির বলে নিজের আত্মসম্ভ্রমকে ভেসে যেতে দিয়ে নিষ্ক্রিয় থেকেছে।

উপন্যাসের মতোই হরিশংকরের ছোটোগল্পে কিছু কিছু ক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনুযায়ী সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গের নিষ্ক্রিয়তা ও প্রতিবাদহীনতা লক্ষ করা গিয়েছে। যেমন 'দইজ্যা বুইজ্যা' গল্পে মুক্তিযুদ্ধের প্রভাবে পাকসেনা দ্বারা জেলেপাড়া অবরুদ্ধ হয়। সেখানে পাঞ্জাবি সৈন্য বেলুচি সৈন্য ও রাজাকার দ্বারা জেলেরা অত্যাচারিত নিপীড়িত হয়। সৈন্যরা বেতের বাড়ি, বন্ধুকের গুঁতো দিয়ে জেলেদের জোর করে গাছ কাটায়। সেগুলি আবার তাদের দিয়েই বহন করায়। মাঝে মাঝে কারো বাড়ির হাঁস-মুরগি-ছাগল-গোরু লুট করে নিয়ে যায়। এত অত্যাচার সহ্য করেও জেলেরা চুপ থেকেছে। গল্পের বর্ণনা অনুযায়ী

> 'জেলেদের মুখে প্রতিবাদের ভাষা নেই। শুধু মনে আগুন জ্বলে, রাগে ক্ষোভে শরীর কাঁপে। সেই কাপুনি অতি কষ্টে জীর্ণ কাপড়ের তলায় ঢেকে রাখে তারা।' (জলদাস ২০১৬ (ক) পৃ. ২৬)

অর্থাৎ রাগে-দুঃখে-ক্ষোভে জেলেদের শরীর কাঁপলেও তারা ক্ষোভ প্রকাশ করতে পর্যন্ত সাহস করেনি, কারণ সৈন্যরা সশস্ত্র। আসলে বন্দুকের নলের সামনে দাঁড়িয়ে আর যাই করা যাক প্রতিবাদ করা যায় না। প্রতিবাদের ফল নির্ঘাত মৃত্যু জেনেই মরণের চেয়ে শোষণ শ্রেয় মনে করে তারা প্রতিবাদহীন ও নিষ্ক্রিয় থেকেছে।

'থুতু' গল্পেও দেখা যায় মুক্তিযুদ্ধের সময় চরখানপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বশিরউদ্দিন সেই অঞ্চলে রাজাকারদের সাহায্যে ভীষণ অত্যাচার চালায়। তাদের অত্যাচারে অধিকাংশ নরসুন্দর পরিবার গ্রাম ত্যাগ করে। কিন্তু বিমল শীলের পরিবার সেখানেই থেকে যায়। ঘটনাচক্রে কোনো একদিন রাস্তায় বশিরের সঙ্গে বিমলের দেখা হলে সে পাশ কাটিয়ে যেতে চাইলে বশিরউদ্দিন হুংকার দিয়ে ওঠে,

> ‘কিথারে মালাউনের পুত, চোখে দেখছ না? আদাব সালাম না দিয়া পাশ কাটাইয়া যাইতাছছ? তুই জানছ না আমি ক্যাটা?’ (জলদাস ২০১৬ (ক) পৃ. ২১৩)

বিমল বশিরের কথায় আঁতকে ওঠে। তার ব্যবহারের জন্য সে ক্ষমা চেয়ে আদাব জানায়। কিন্তু বশির আরো রেগে গিয়ে তাকে গালমন্দ করে এবং এর শাস্তি পেতে হবে বলে বিমলকে হুমকি দেয়। ফলে কোনো এক শুক্রবার দুপুরে রাজাকারের দলেরর সাহায্যে বশির বিমলের পরিবারকে জোরপূর্বক মসজিদে নিয়ে যায়। সেখানে তার পরিবারকে মুসলমান করা হল।

> ‘বিমলের মুসলমানি নাম রাখা হল ইজ্জত আলী। ইজ্জত আলী মাথায় টুপি পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরল।’
>
> (জলদাস ২০১৬ (ক) পৃ. ২০৩)

গল্পে বশির ক্ষমতাধারী ও অত্যাচারী। তাকে আদাব না জানানোকে সে অপরাধের দৃষ্টিতে দেখেছে। আধিপত্যের এই ধরনটি একটি চমকপ্রদ উদাহরণ। কিন্তু বিমল এখানে সাধারণ সহায়-সম্বলহীন একজন নাপিত। সে অত্যাচারের ভয়ে অন্যান্যদের মত গ্রাম ত্যাগ করতে পারে না নিরুপায় হয়ে। ফলে বশিরউদ্দিনের অধীনে একান্ত অনুগত হয়ে দৈনন্দিন জীবনযাপন করে বিমল। তাই তাকে ধর্মান্তরিতকরণে বাধ্য করা হলেও সে তার প্রতিরোধ করতে পারেনি।

শুধু বিমলই নয়, বশিরউদ্দিনের অত্যাচারের শিকার হয় মুক্তিযোদ্ধা শামসুর। কিন্তু পঙ্গু শামসু তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নিতান্তই দুর্বল। ফলে স্ত্রী-কন্যা নিয়ে সে এক বস্তিতে আশ্রয় নেয়। কিন্তু সেখানে শামসুর অনুপস্থিতিতে পাশের ঝোপের সিরাজের বাবা তার কন্যা ফারহানকে ধর্ষণের চেষ্টা করে। এই ঘটনা ফারহানা তার বাবা মার কাছে প্রকাশ করে না। কারণ সে জানে,

> ‘জানালে দুঃখ বাড়বে মা বাবার। হয়তো সিরাজের বাপের সঙ্গে ঝগড়া জড়িয়ে পড়বে তারা। চার-পাঁচটা পোলা সিরাজের বাপের। যদি মারামারি লাগে তাহলে তার পঙ্গু বাপ পড়ে পড়ে মার খাবে। তারচেয়ে কিল খেয়ে কিল হজম করে যাওয়া ভালো।’ (জলদাস ২০১৬ (ক) পৃ. ২২০)

ফারহানার চেতনায় পিতার অক্ষমতা ও পঙ্গুত্ব বড়ো হয়ে উঠেছে বলে সে প্রতিবাদের রাস্তা বেছে নেয়নি। কারণ সে জানে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের যে বল ও ক্ষমতার প্রয়োজন তা তার পিতার নেই। বরং অন্যায়কারীর চার-পাঁচটি ছেলে। তারা চাইলে তার পিতাকে উল্টে হেনস্থা করতে পারে। এই ভেবেই ফারহানা নিষ্ক্রিয় থেকে সব কিছু সহ্য করে নিয়েছে।

আবার ‘রতন’ গল্পটি রতন নামক এক কিশোরীর শ্যাওলার মতো ভাসমান জীবন কাহিনির বিবরণ। গল্পে দেখা যায় অলিপুর গ্রামের পোস্ট মাস্টারের কাছে রতন পরিচারিকার কাজ করতো একটা সময়। কিন্তু পোস্টমাস্টারের চাকরি কলকাতায় বদলি হয়ে গেলে রতন তার এক দূরসম্পর্কের কাকার

কাছে আশ্রয় পেল। অভাবের তাড়নায় তার কাকা এক বৃদ্ধের সঙ্গে রতনের বিয়ে দিয়েছে। বিয়ের সাত আট বছর পর বৃদ্ধ মারা গেলে তার পূর্বের স্ত্রীর ছেলেরা রতনকে তাড়িয়ে দিয়েছে বাড়ি থেকে।

> ‘শ্রাদ্ধ সাঙ্গ হওয়ার পরপরই কিছু টাকা করি রতনের আঁচলে বেঁধে দিয়ে থাকে ঘর থেকে বের করে দিল ছেলেরা।’
>
> (জলদাস ২০১৬ (ক) পৃ. ২০৩)

নিজের নিম্নবর্গীয়তা একপ্রকার মেনে নিয়েই রতন মুখ বুজে সেখান থেকে চলে এসেছে। বৃদ্ধ খগেন্দ্রনাথের স্ত্রী হওয়ার অধিকারটুকু সে দাবি করার সাহস সঞ্চয় করতে পারেনি। এই নিষ্ক্রিয়তা ও ভীরুতা একজন নারীর নিম্নবর্গীয়তাকেই প্রমাণ করেছে।

ক্ষমতার সম্পর্কের একদিকে আধিপত্য থাকলে তার অপর প্রান্তে অবশ্যই প্রতিবাদ-প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। কিন্তু সামগ্রিক আলোচনায় দেখা গেল পরিস্থিতি ও ক্ষমতার প্রাবল্যের কাছে প্রতিরোধ কেন, কোনো প্রতিবাদ স্বরূপ প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত লক্ষ করা যায়নি। নিম্নবর্গের এই একান্ত অনুগত জীব হয়ে দৈনন্দিন অধীন জীবনযাপন নিম্নবর্গের নিম্নবর্গীয়তাকে যেমন স্পষ্ট করে তেমনই এই নিষ্ক্রিয়, ভীরুতা ও প্রতিবাদহীনতাই একটা সময় পরোক্ষভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতেও সাহায্য করেছে।

৫.৫ নিম্নবর্গের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ব্যর্থতার আখ্যান

প্রভুত্বের বিরুদ্ধে অধীনস্তরা বহুকাল থেকেই প্রতিবাদ করে এসেছে। সেই প্রতিবাদের চূড়ান্ত পর্যায় হিসেবে যে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে তার সর্বাঙ্গীণ রূপ দেখতে পাওয়া যায় ইতিহাসে ঘটে যাওয়া কৃষক বিদ্রোহে। কিন্তু সেই বিদ্রোহগুলি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। কারণ উচ্চবর্গের ক্ষমতার দৃষ্টিতে তথাকথিত নিম্নবর্গের ঐক্যবোধ ও সম্মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্য ধরা পড়ে না। উচ্চবর্গ ধরে নেয় যে, নিম্নবর্গের একত্রিত হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলার মধ্যে কোনো নিজস্বতা নেই। (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ.৪১) সুতরাং প্রতিরোধকে আটকাতে তারা পরিস্থিতিভেদে নানা কৌশলে দমননীতির প্রয়োগ করে। সেই দমননীতিতে উচ্চবর্গ কখনো আইনের, কখনো প্ররোচনা বা ষড়যন্ত্রের, আবার কখনো বাহুবলের সাহায্য নেয়, যা নিম্নবর্গ কখনোই পায় না। ফলে নিম্নবর্গের প্রতিরোধ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। সমালোচক ডেভিড আর্নল্ড তাঁর ‘Gramsci and Peasant Subalternity in India’ প্রবন্ধে কৃষক বিদ্রোহের ব্যর্থতা প্রসঙ্গে আন্তনিও গ্রামশির বক্তব্যকে সামনে রেখে মন্তব্য করেন যে,

> ‘He saw little evidence of autonomy in peasant movements, both in the specipic sense of their failure to generate their own leadership and organization and to formulate their own demands effectively, and in the broader sense of being unable to mount an ideological and political assault capable of overthrowing the domination and hegemony of the ruling classes. ‘Subaltern groups’, we are

> reminded, ‘are always’ subject to the authority of ruling groups, even when they rebel up and rise up.’ (Chaturvedi (ed.)2000, p. 34)

অর্থাৎ গ্রামশি কৃষক আন্দোলনের মধ্যে স্বায়ত্ত্ব শাসনের প্রমাণ হিসেবে দেখেছেন, যে কৃষকরা নিজস্ব নেতৃত্ব ও সংগঠন তৈরি উভয় ক্ষেত্রেই ব্যর্থতার অনুভূতির সঙ্গে তাদের দাবি কার্যকর করে। ফলে এই অক্ষমতার সঙ্গেই তারা একটি আদর্শিক ও রাজনৈতিক শাসকশ্রেণির প্রতি আক্রমণ করে যাকে শাসকশ্রেণি ক্ষমতা ও আধিপত্য দ্বারা উৎখাত করতে সক্ষম। এ প্রসঙ্গে গ্রামশি মনে করিয়ে দেন যে, নিম্নবর্গ যতই প্রতিরোধ বা বিদ্রোহ করুক, সেই মুহূর্তেও নিম্নবর্গ সর্বদা শাসকগোষ্ঠীর কর্তৃত্বের অধীনেই থাকে। ফলে কৃষক তথা নিম্নবর্গের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

‘সাবঅলটার্ন স্টাডিজ’-এর প্রথম খণ্ডে রণজিৎ গুহ তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ‘On Some Aspects Of the Historiography of Colonial India’-প্রবন্ধে ঔপনিবেশিক কালখণ্ডে ঘটে যাওয়া কৃষক বিদ্রোহের প্রসঙ্গ এনেছেন বারবার। ইতিহাস ও কৃষক বিদ্রোহের নানা দলিল দস্তাবেজের সাহায্যে তিনি প্রতিটি বিদ্রোহের চরিত্র অনুধাবনের চেষ্টা করেছেন। কারণ তিনি উপলব্ধি করেছেন বিদ্রোহের ঐতিহ্যই নিম্নবর্গের রাজনীতির একটি ধ্রুব উপাদান। (Guha (ed.) 1982, p. 12) রণজিৎ গুহের এই বক্তব্যের প্রসঙ্গে সমালোচক পার্থ চট্টোপাধ্যায় কৃষক বিদ্রোহের ব্যর্থতার সম্পর্কে জানান,

> ‘Imbricated with this was another sets of relationships in which hierarchy was based on direct and explicit domination and subordination of less powerful through both ideological-symbolic means and physical force. The semiotics of domination and subordination were what the subaltern classes sought to destroy everytime they rose up in rebellion.’ (Schwarz (eds.) 2005, p. 474)

অর্থাৎ আধিপত্য ও অধীনতা ক্ষমতার এমন দুটি বর্গ যা প্রতিটি ক্ষেত্রেই দ্ব্যণুক অবস্থানে অবস্থিত। সুতরাং নিম্নবর্গীয় চেতনায় যদি প্রতিরোধী সত্তা একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে থাকে তাহলে এর বাইনারি অবস্থানে উচ্চবর্গীয় রাজনৈতিক চেতনায় সেই প্রতিরোধকে যে কোনো উপায়ে ধ্বংস করার বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। তাই রণজিৎ গুহ কৃষক বিদ্রোহের চরিত্র বিশ্লেষণে দেখেছেন,

> ‘... উচ্চবর্গ ও নিম্নবর্গের মধ্যে প্রভুত্ব ও অধীনতার অতি প্রাচীন সম্পর্ক এবং প্রভুর বিরুদ্ধে অধীনের বহুকালব্যাপী, যদিও ব্যর্থ, প্রতিবাদ।’ (ভদ্র (সম্পা.) ১৯৯৮, পৃ. ৪১)

হরিশংকর জলদাসের কথাবিশ্বে বিশেষ করে জলপুত্র, দহনকাল, মোহনা ও রামগোলাম উপন্যাসে আমরা নিম্নবর্গের শ্রেণিচেতনা ও প্রতিবাদ স্বরূপ প্রতিরোধ গড়ে ওঠার পাশাপাশি তা প্রতিবার ব্যর্থ হতে দেখেছি।

‘জলপুত্র’ উপন্যাসে যখন গঙ্গাপদর ঐকান্তিক চেষ্টায় জেলে জীবনে অধিকার চেতনা জাগরণের মধ্য দিয়ে পরিবর্তনের বাঁক এসেছে, যখন জেলেদের পরস্পর সহযোগিতায় শুক্কুর ও শশিভূষণের দেওয়া

ঋণের ওপর নির্ভরতা থেকে মুক্তির পথ খোঁজার চেষ্টা চলছিল, ঠিক তখনই জেলেদের এই পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করার জন্য দাদনদারদের চেতনায় জেলেদের 'উচিত শাস্তি' দেওয়ার কথা মনে হয়েছে। তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সমুদ্রে জেলেদের মাছ ধরার স্থানে নিজেদের ভাড়া করা মুসলমান জেলেদের দ্বারা জাল পাতিয়েছে। জেলেদের ভাতে মারার উদ্দেশ্যে যে তাদের এই পরিকল্পনা তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু জেলেরা সমবেত হয়ে এই অন্যায়ের প্রতিরোধ স্বরূপ যখন শুক্কুর ও শশিভূষণকে শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন জেলেদেরই একজন অর্থাৎ বিজন বহদ্দারের ঘনিষ্ঠ পাউন্যা গোপাল জলদাস জেলেদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। সে জেলেদের গোপন পরিকল্পনার কথা দাদনদারদের জানিয়ে দেয়। শশিভূষণের কথায়,

> 'জাইল্যা অইলে কি অইবো। আস্ত মীরজাফর। জাইল্যা অলর বিয়াগ গোপন কথা, পরিকল্পনা এই গোয়াইল্যাই আঁরারে সাপ্লাই দিএ। ইতে আঁরার মানুষ। আঁরার কিনা গোলাম।' (জলদাস ২০০৮, পৃ. ১১৩)

অর্থাৎ অর্থের লোভে গোপাল দাদনদারদের কাছে বিকিয়ে গিয়েছে। তার কাছে শ্রেণিস্বার্থের থেকে নিজের স্বার্থ বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। সকল গোপন কথা রাতের আধারে সে তাদের জানিয়ে আসে আর বিনিময়ে অর্থ পায় সে। যে রাতে জেলেরা মিলে শুক্কুর-শশিভূষণকে মারার পরিকল্পনা করেছে, তার খবর সেই রাতেই গোপাল তাদের কাছে পৌঁছে দেয়।

> 'খবর সাংঘাতিক। কালিয়া তোঁয়ারার সর্বনাশ অইবো। জাইল্যা অলে ক্ষেপি গেইয়ে গই। গঙ্গা বিয়াগ্‌গুনেরে জাগাই তুইল্যে। একজোট গইয্যে। কালিয়া গঙ্গা বিয়াগ জাইল্যারে লই দইজ্যার মাঝে তোঁয়ারার উঅর ঝাঁপাই পড়িবো।'
>
> (জলদাস ২০০৮, পৃ. ১২৪)

জেলেদের এই ধরনের পদক্ষেপের কথা শুনে শুক্কুর প্রাণের ভয়ে সংকুচিত হয়ে গেলেও শশিভূষণ ঠাণ্ডা মাথায় এর থেকে মুক্তির উপায় খোঁজে। একটা সময় সে সিদ্ধান্ত নেয়, প্রতিরোধের মাথাকেই সরিয়ে দেওয়ার। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেই রাতেই তারা গঙ্গাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। পরদিন সকালে গঙ্গার মৃত্যুর খবর জেলেপাড়ায় ছড়িয়ে পড়ে।

এই পুরো ঘটনায় লক্ষণীয়, উচ্চবর্গের প্রতিভূ শুক্কুর ও শশিভূষণ তাদের ক্ষমতার দৃষ্টিতে জেলেদের ঐক্যবোধ ও শ্রেণিচেতনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অজ্ঞাত হলেও বিশ্বাসঘাতক গোপাল মারফৎ জেলেদের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত হয়ে যায়। তাই সেই প্রতিরোধকে আটকাতে তারা উচ্চবর্গের আধিপত্যের রাজনৈতিক কৌশলে গঙ্গাকে হত্যা করে জেলেদের প্রতিরোধের গতিমুখকে গঙ্গার মৃত্যুর দিকে ঘুরিয়ে দেয়।পলাতক শুক্কুর-শশিভূষণকে শাস্তি দিতে ব্যর্থ হলেও ক্ষোভে-দুঃখে তারা তাদের খামারে আগুন লাগায়। কিন্তু জেলেদের প্রতিশোধস্পৃহা স্তিমিত হয় না। কারণ তাদের বিশ্বাস, যে গঙ্গাপদ

জেলেদের অধিকার নিয়ে লড়াই শুরু করেছিল তাকে সম্পূর্ণ করবে গঙ্গার অনাগত সন্তান বনমালী। এই ভরসায় তারা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকে।

আবার ‘দহনকাল’ উপন্যাসে পাক সৈন্য দ্বারা অবরুদ্ধ উত্তর পতেঙ্গা গ্রামের জেলেরা দৈনন্দিন অত্যাচার-নিপীড়নে বিপর্যস্ত হওয়ার ফলে সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলে। রাধেশ্যাম দা দিয়ে আনসারির মাথা বরাবর আঘাত করলে তার মৃত্যু হয়। এরপর চারিদিক থেকে জেলেদের হঠাৎ আক্রমণে পাক সৈন্যের দলটি পথ না পেয়ে পালিয়ে যায়।

এ পর্যন্ত ঘটনায় আপাতভাবে মনে হতে পারে, জেলেদের প্রতিরোধ সফল হয়েছে। তবে তা সাময়িক। কয়েকজন পাক সৈন্যকে আক্রমণ করে জেলেরা অজান্তেই পাকসৈন্য বাহিনীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জড়িয়ে পড়েছে। আনসারির মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রতিশোধ সম্পূর্ণ হলেও তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল পাক সৈন্যের কবল থেকে মুক্তি। কিন্তু পরদিন সকালে এর ফল স্বরূপ দেখা গেল, মেজর গিলানী তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে জেলেপাড়ায় ধ্বংসলীলা চালিয়েছে।

> ‘জেলেপাড়া ঘিরে ফেলার আগে মেজর গিলানী সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বলেছিল—প্রথমে আনসারির দলটিকে খুঁজে বার কর; তারপর আগুন লাগাও, হত্যা কর। আমি পোড়া মাটি চাই, একজন লোকও যাতে জীবিত না থাকে। কুকুর-বেড়ালকেও ছাড়বে না। ও গুলোকেও গুলি করবে।’ (জলদাস ২০১০, পৃ. ১৯৫)

আসলে বন্দুক ও মানুষের দ্বন্দ্বে যে বন্দুকেরই জয় হয়—এ কথা বলাই বাহুল্য। তাই রাধানাথরা সম্মিলিত হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুললেও সশস্ত্র পাক সৈন্যের কাছে তারা নির্বিচারে প্রাণ হারায়। উপন্যাসের শেষে তাই দেখা যায়,

> ‘রোদে-আগুনে জেলেপাড়া ছারখার। জেলেপাড়ার অধিকাংশ ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। দু’একটি ঘর এখনো জ্বলছে।...চারিদিকে ভয়ংকর ভুতুড়ে পরিবেশ, শ্মশানের নিস্তব্ধতা।’ (জলদাস ২০১০, পৃ. ১৯৫)

দেখা গেল, রাধানাথের বাড়িতে তিনটি নারকেল গাছের সঙ্গে বাঁধা রাধানাথ, নিকুঞ্জ ও ইমাম খবিরুদ্দিনের লাশ। উঠোনে চন্দ্রকলার মৃতদেহ। কোনো রকমে প্রাণে বেঁচে গিয়েছে বসুমতী, হরিদাস ও ইন্দ্রবালা। আমরা উপন্যাসে জেনেছি, পাক সরকার সৈন্যদের পূর্ব পাকিস্তানে পাঠিয়েছিল মুক্তিযোদ্ধাদের ধ্বংস করতে। আর এই কাজটি সহজ নয় বুঝতে পেরে মেজর গিলানী কিছু বাঙালি বিশ্বাসঘাতককে পাশে চেয়েছিলেন যারা মানুষের মধ্যে থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের গোপনীয়তা প্রকাশ করবে। তাই সে ক্যাপ্টেন ইকবালকে আদেশ দিয়েছিল,

> ‘... হামে কুছ মীরজাফর বাঙ্গালিয়োঁ কি জরুরত হ্যায়। ঢুন্ডো—ইস গাঁওমে মীরজাফর কিতনে হ্যায়। মীরজাফরকে লিডার কো পকড় লে আও।’ (জলদাস ২০১০, পৃ. ১৪৩)

মীরজাফরকে খুঁজে বার করার আগেই আশ্চর্যজনকভাবে মীরজাফর বিশ্বাসঘাতক আব্দুল খালেক তার দলবল নিয়ে মেজরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। গিলানী খালেকের সাহায্যে রাজাকার বাহিনী গঠন করে এলাকায় ভীতি সৃষ্টি করিয়েছে। 'জলপুত্র' উপন্যাসের গোপালের মতোই আলোচ্য উপন্যাসের রাজাকাররা নিজ জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। পাক সৈন্যের ক্ষমতার জোরে নিজেদের মানুষকেই বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে বারবার। বিশ্বাসঘাতকতার কারণে প্রভুশক্তি আরো বেশি শক্তিশালী ও অধীনস্তরা আরো দুর্বল হয়ে পড়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সবল-দুর্বলের লড়াইয়ে জেলেদের পরাজয় ও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে।

একইভাবে 'মোহনা' উপন্যাসে পালরাজা রামপালের আক্রমণের বিরুদ্ধে কৈবর্ত রাজ্যের তথাকথিত নিম্নবর্গীয় প্রজারা রাজা দিব্যোকের আমল থেকে রাজা ভীমসেনের আমল পর্যন্ত তাদের নেতৃত্বে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছে। প্রতিবারই পাল রাজারা কৈবর্তদের তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। কিন্তু ভীমের পালিত পুত্র চণ্ডকের সেনানায়কত্বে ভীম রামপালের কাছে পরাজিত হয়েছে। কৈবর্তদের সম্মিলিত প্রয়াস ও প্রতিরোধ ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার পেছনে রয়েছে চণ্ডকের বিশ্বাসঘাতকতা। আর এই বিশ্বাসঘাতকতার কারণ তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতার লোভ। আমরা জানি, ভীম একদিন চণ্ডককে রাস্তা থেকে তুলে এনে রাজপরিবারের সদস্য ও পুত্র রূপে লালন করেছিলেন। কিন্তু চণ্ডকের মনে হয়েছে তার বীরত্বকে ভীম কেবল তার রাজ্য সুরক্ষিত করার জন্য কাজে লাগিয়েছে, পরিবর্তে তাকে প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা দেননি। চণ্ডকের মনের এই ক্ষোভের কথা টের পান রামপাল। ফলে উচ্চবর্গের রাজনৈতিক কৌশলে তিনি চণ্ডকের এই ক্ষোভকে নিজ স্বার্থে কাজে লাগাতে চেয়েছেন। তাই তো রামপাল তার দূত অনোমদর্শীকে চণ্ডকের কাছে পাঠান এই বার্তা দিয়ে,

> '...রাজা রামপাল আপনার বীরত্বে মুগ্ধ। শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা হিসেবে আপনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা রয়েছে তাঁর। আপনি যদি তাঁকে সহযোগিতা করেন, আপনাকে তিনি তাঁর বাহিনীর প্রধান সমরনায়ক করবেন। প্রধান সেনাপতির মানমর্যাদা আর ক্ষমতার কথা আপনার অজানা নয়।' (জলদাস ২০১৩, পৃ. ১০৭)

প্রাথমিকভাবে চণ্ডক এই প্রস্তাবে সমর্থন না জানালেও তার মনের সুপ্ত লোভ ও আকাঙ্ক্ষা তাকে বিশ্বাসঘাতকে পরিণত করেছে। রামপালের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে তাই সে যুদ্ধক্ষেত্রে ভীমের হাতির চোখে খড়গ দিয়ে আঘাত করে। যন্ত্রণায় কাতর হাতিটি উন্মত্ত হয়ে পালরাজাদের চক্রব্যূহে ঢুকে পড়লে রাজা ভীমসেন পালদের কাছে বন্দি হয়ে পড়ে। রাজার করুণ পরিণতিতে কৈবর্ত বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয় এবং চণ্ডকের বিশ্বাসঘাতকতায় কৈবর্তদের প্রতিরোধ ব্যর্থ হয়ে যায়।

'রামগোলাম' উপন্যাসেও মেথরসমাজকে একইভাবে কর্পোরেশনের বড়োবাবু আবদুস ছালামের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে দেখা গিয়েছে। কারণ মেথরদের জন্য সংরক্ষিত চাকরি তিনি সমাজের অন্যান্যদের জন্য উন্মুক্ত করে দিতে চেয়েছেন। অস্তিত্বের সংকটে মেথররা ঐক্যবদ্ধ হলে আবদুস ছালাম তাদের ঐক্যে ভাঙন ধরিয়েছেন। এর জন্য তিনি টাকার লোভ দেখিয়ে মেথরসমাজের যোগেশকে নিজের দলে টানতে সক্ষম হয়েছেন। আলোচ্য উপন্যাসে তাই যোগেশকে বড়োবাবুর তোষামোদ করতে দেখা গিয়েছে। গঙ্গাপদ, চণ্ডকের মতো সেও তার শ্রেণিস্বার্থ থেকে নিজ স্বার্থকে বড়ো করে দেখেছে। তাইতো কার্তিকের মুখে তার প্রতি ক্ষোভ উগরে দিতে দেখেছি,

> 'তুমি ছালাম সাহেবের দালালি করছ। আমাদের পেটে লাথি দেয়ার দলে ভিড়েছ। তুমি হরিজন-সমাজের বিভীষণ।'
>
> (জলদাস ২০১২, পৃ. ৩৪)

আমরা লক্ষ করলাম উচ্চবর্গের প্রতিভূ আবদুস ছালাম মেথরদের প্রতিরোধকে ঠেকাতে মেথরদেরই একজনকে (যোগেশ) অর্থ দিয়ে কেনা গোলামে পরিণত করেছেন। যোগেশকে যেমন তিনি মেথরদের পরিকল্পনা জানতে ব্যবহার করেছেন, তেমনই ধর্মঘটকে উৎখাত করতে যোগেশকেই খুন করিয়েছেন যাতে সেই খুনের অভিযোগ তিনি প্রতিরোধের প্রতিনিধি রামগোলাম ও কার্তিকের ওপর চাপাতে পারেন। এক্ষেত্রে আবদুস ছালাম আইনের সাহায্য নিয়ে রামগোলাম ও কার্তিককে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন মিথ্যে সাক্ষীর মাধ্যমে। অনুগত হেডক্লার্ক ও পিয়নকে আবদুস ছালাম মিথ্যে সাক্ষীর জন্য কাজে লাগিয়েছেন। পিওন ইকবাল তাই পুলিশের কাছে মিথ্যে বলে,

> 'হুজুর, আমার নিজের চোখে দেখা—রামগোলাম যোগেশের গলা চিপে ধরেছে আর কার্তিক পেছন থেকে বেলচা দিয়ে এক বাড়ি। ও মারে বলে যোগেশ মাটিতে পড়ে গেল।' (জলদাস ২০১২, পৃ. ১৯০)

দুবছর সেই খুনের মামলা চলার পর কার্তিকের মৃত্যুদণ্ড ও রামগোলামের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। দেখা গেল, যে দুজন প্রতি মুহূর্তে শ্রেণিস্বার্থে ও অধিকারবোধে মেথরসমাজকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছে, প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে—তাদের খুব সহজেই আবদুস ছালাম কৌশলে সরিয়ে দিয়েছে। সুতরাং নেতৃত্বের অভাবে মেথরদের ধর্মঘট করার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাই আবদুস ছালাম অন্যান্য জাতের মানুষদের মেথরের কাজে নিযুক্ত করেছে। ফলে মেথরদের জীবন পুনরায় অর্থনৈতিক সংকট ও বঞ্চনায় দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে।

আলোচ্য চারটি উপন্যাসে বর্ণিত তথাকথিত নিম্নবর্গের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ব্যর্থতার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই সাযুজ্য রয়েছে। যেমন,

এক. প্রতিটি প্রতিরোধের স্থান, কাল, পাত্র, ঘটনা, উদ্দেশ্য ও সামাজিক পরিচয় ভিন্ন হলেও তা ব্যর্থ হয়েছে মূলত কোনো একজন বিশেষ ব্যক্তির স্বজাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার কারণে। উদাহরণ স্বরূপ বিশ্বাসঘাতক হিসেবে দেখলাম ‘জলপুত্র’-এর গোপাল জলদাস, ‘দহনকাল’-এর রাজাকার, ‘মোহনা’-র চণ্ডক ও ‘রামগোলাম’-এর যোগেশকে।

দুই. প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রতিরোধের উদ্দেশ্য আধিপত্য থেকে মুক্তি পাওয়া হলেও প্রতিশোধস্পৃহাই শেষ পর্যন্ত তথাকথিত নিম্নবর্গের প্রতিরোধের উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও এই প্রতিশোধস্পৃহার দৃশ্যটি কোথাও স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট।

তিন. প্রতি ক্ষেত্রেই তথাকথিত নিম্নবর্গের ঐক্যবোধ ও শ্রেণিচেতনার প্রতি উচ্চবর্গের উদাসীনতাই তাদের প্রতিরোধের পরিকল্পনার কারণ। এ প্রসঙ্গে বলতে হয়, নিম্নবর্গের চেতনায় প্রতিবাদ যদি একটি লক্ষণ হয়, তাহলে এর বিপরীতে উচ্চবর্গীয় চেতনার বৈশিষ্ট্য হল, যেকোনো উপায়ে প্রতিরোধ দমন করা। তাইতো আলোচ্য উপন্যাসগুলিতে উচ্চবর্গের প্রতিভূরা কখনো বলপ্রয়োগ করে, কখনো আইনের সাহায্য নিয়ে প্রতিরোধকে দমন করেছে।

চার. সর্বোপরি, প্রতিটি প্রতিরোধের ব্যর্থতার পেছনে রয়েছে নিম্নবর্গের সংহতির অভাব, সীমিত শক্তি ও বুদ্ধি। কারণ সংহতির অভাবেই নিম্নবর্গের মধ্য থেকেই বিশ্বাসঘাতকের জন্ম হয়েছে। আর উচ্চবর্গ নিম্নবর্গের নিত্য অভাব ও দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়েছে খুব সহজেই।

আলোচ্য উপন্যাসগুলির নিরিখে নিম্নবর্গের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের উপরিউক্ত চরিত্র ও ব্যর্থতার কারণগুলি দেখানোর পাশাপাশি মনে পড়ে ‘সাবঅলটার্ন স্টাডিজ’-এ সমালোচিত বিদ্রোহী কৃষকচেতনার কথা। কারণ কৃষক বিদ্রোহগুলির ব্যর্থতার পেছনে নিম্নবর্গের ঐতিহাসিক-সমালোচকরা যে যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেছেন, তা কথাবিশ্বে বর্ণিত নিম্নবর্গীয় প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ব্যাখ্যায় খুবই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। সমালোচক পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের কৃষক বিদ্রোহের সমালোচনার অনুষঙ্গে কৃষকদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ব্যর্থতাকেও অনুধাবন করেছেন। তাঁর মতে সংহতির অভাবই কৃষকদের বিদ্রোহের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। তবে এই কারণটি শুধু কৃষকই নয়, তথা সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গের প্রতিরোধের ব্যর্থতার ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক। তিনি উচ্চবর্গীয় রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে নিম্নবর্গের রাজনৈতিক চেতনার পার্থক্য বোঝাতে গিয়ে বলেন,

> ‘The process is quite the opposite in the consciousness of a rebellious peasantry. There solidarities do not grow because individual feel they can come together with others on the basis of their common individual interests : on the contrary, individuals are enjoined to act with in a collectivity because, it

is believed, bonds of solidarity that tie them together already exist. Collective action does not flow from a contract among individuals; rather, individual identities themselves are derived from membership in a community.’ (Chaturvedi (ed.) 2000, p.14)

৫.৬ সারাংশ

উচ্চবর্গের রাজনীতিতে সংহতি গড়ে ওঠে একটি সমষ্টিগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যার দ্বারা ব্যক্তিরা সর্বজনীন স্বার্থের ভিত্তিতে একজোট বা একত্রিত হয়। কিন্তু বিদ্রোহী কৃষকের চেতনায় প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানে সংহতি বৃদ্ধি পায় না কারণ ব্যক্তি মনে করে যে, তারা তাদের সর্বজনীন ব্যক্তিগত স্বার্থের ভিত্তিতে অন্যান্যদের সঙ্গে একত্রিত হয় এবং বিপরীতে ব্যক্তিকে একটি দলের মধ্যে থেকে কাজ করার নির্দেশ দেয়। কারণ এটা বিশ্বাস করা হয় যে, সংহতির বন্ধন তাদের বেঁধে রেখেছে। আসলে সম্মিলিত পদক্ষেপ ব্যক্তিদের মধ্যে কোনো পরিকল্পনা বা চুক্তি দ্বারা সম্পাদিত হয় না, বরং সংহতি একটি সম্প্রদায়ের সদস্যপদ থেকে উদ্ভূত হয়ে নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরি করে।

আমরা তাই দেখলাম, এই সংহতির অভাবেই ‘জলপুত্র’ উপন্যাসে গঙ্গাপদ দ্বারা গড়ে তোলা প্রতিরোধে ব্যক্তিগত স্বার্থের ভিত্তিতে জেলেরা অন্যান্যদের সঙ্গে একত্রিত হলেও গঙ্গার নির্দেশ থাকে একটি দলের মধ্যে থেকে শুক্কুর-শশিভূষণদের বিরুদ্ধে আঘাত হানার। কারণ গঙ্গা বিশ্বাস করেছিল সংহতির বন্ধন জেলেদের একত্রিত করেছে। কিন্তু ব্যক্তি গোপাল জলদাস গঙ্গার এই নির্দেশকে মনে থেকে মেনে নেয়নি বলেই একই শ্রেণিভুক্ত হওয়ার ফলে তাকে চুপ থেকে সংহতির বন্ধনের বিশ্বাসকে অটুট রাখতে হয়েছে। তাইতো সে জেলেদের দলের মধ্যে থেকে শুক্কুর-শশিভূষণের কাছে জেলেদের গোপন পরিকল্পনা ফাঁস করেছে। ফলে খুব সহজেই শুক্কুর-শশিভূষণ গঙ্গাকে হত্যা করার মাধ্যমে জেলেদের প্রতিরোধকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। একইভাবে ‘মোহনা’ উপন্যাসে চণ্ডকের মধ্যেও শ্রেণিস্বার্থের থেকে ব্যক্তিস্বার্থ বড়ো হয়ে উঠেছে বলেই সে রামপালের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে ভীমকে পরাজিত করে। যার ফলে কৈবর্তরা পালদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়। ‘দহনকাল’ উপন্যাসেও বাঙালি হয়ে আব্দুল খালেক পাক-সৈন্যদের রাজাকার বাহিনী গঠনে সাহায্য করে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আবার ‘রামগোলাম’-এ যোগেশ বড়োবাবুর কেনা গোলাম হয়ে মেথরদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, যা আসলে সংহতির অভাবকেই প্রমাণ করে। অর্থাৎ ‘সাবঅলটার্ন স্টাডিজ’-এ আলোচিত কৃষক বিদ্রোহের নিরিখে উঠে আসা কৃষকের বিদ্রোহী চেতনার নেতিবাচকতা আসলে যে শুধু কৃষকই নয়, সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গের প্রতিবাদী চেতনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, তা আমরা হরিশংকর জলদাসের আলোচ্য কথাবিশ্বের নিরিখেও অনুধাবন করলাম।